

সত্য ধর্ম

লেখক: ফযীলাতুশ শাইখ

আব্দুর রহমান বিন হাম্মাদ আল-উমার

شركاء التنفيذ:



المحتوى الإسلامي



رواد الترجمة



جمعية الربوة



دار الإسلام

يتاح طباعة هذا الإصدار ونشره بأي وسيلة مع
الالتزام بالإشارة إلى المصدر وعدم التغيير في النص.



Telephone: +966114454900



ceo@rabwah.sa



P.O.BOX: 29465



RIYADH: 11557



www.islamhouse.com

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি

ভূমিকা ও উৎসর্গ

সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহরই জন্য। সালাত ও সালাম নাযিল হোক আল্লাহর সকল রাসূলগণের ওপর। অতঃপর,

এটি মূলত: মুক্তির পয়গাম। আমি এটি পৃথিবীর সকল বিবেকবান মানুষের জন্য পেশ করছি, হোক সে পুরুষ অথবা নারী। এ প্রত্যাশা নিয়ে যে, সর্বোচ্চ ও মহা ক্ষমতাধর আল্লাহ যেন এর মাধ্যমে এমন ব্যক্তিকে হিদায়াতের সৌভাগ্য দান করেন, যে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে। এ ছাড়াও আমি আশা করি যে, আল্লাহ যেন আমাকে এবং যারা এটি প্রকাশের ব্যাপারে অবদান রাখবে তাদের সকলকে সর্বোত্তম পুরস্কার দান করেন। অতঃপর আল্লাহর কাছেই যাবতীয় সাহায্য চেয়ে বলছি:

হে জ্ঞানী মানুষ! জেনে রেখো, যে রব তোমাকে সৃষ্টি করেছে, যার প্রতি তুমি ঈমান এনেছ এবং তাঁরই ইবাদত করে থাক, তাকে ছেনা ও জানা ছাড়া এ দুনিয়াতে এবং মৃত্যুর পরে আখিরাতে জীবনে তোমার কোন কল্যাণ বা সফলতা নেই। এ ছাড়াও তোমার রব তোমার প্রতি ও সকল মানুষের প্রতি যে নবীকে প্রেরণ করেছে তাকে না জানা, তার

প্রতি ঈমান না আনা এবং তার অনুসরণ না করা পর্যন্ত তুমি নাজাত বা মুক্তি পাবে না। আরও নাজাত পাবে না সেই সত্য দীনকে না জানা পর্যন্ত যে দীনকে মানা, তার প্রতি বিশ্বাস করা ও তদনুযায়ী আমল করার জন্য তোমার রব তোমাকে আদেশ দিয়েছেন।

তোমার সামনে “সত্য ধর্ম” নামক যে কিতাবটি রয়েছে, সেটির উদ্দেশ্য হচ্ছে- উপরোক্ত মহা মূল্যবান বিষয়গুলো বর্ণনা করা। যেগুলো জানা ও তদনুযায়ী আমল করা তোমার ওপর আবশ্যিক। আর আমি পাদটিকার মধ্যে অধিকতর ব্যাখ্যার জন্য কতিপয় শব্দার্থ ও মাসআলা সম্পর্কে আলোচনা করেছি এবং এর প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমি আল্লাহ তা’আলার কালাম ও তাঁর রাসূল -সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর হাদীসসমূহের ওপর নির্ভর করেছি; কেননা এ দুটিই মূলত এ সত্য দীনের মূল উৎস, যে দীন ছাড়া অন্য কোন দীন আল্লাহ কারো থেকে কবুল করবেন না।

আর এক্ষেত্রে আমি অন্ধ তাকলীদকে পরিহার করেছি যা অধিকাংশ মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছে। বরং কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমি এমন কতিপয় বিভ্রান্ত সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করেছি, যারা হকের দাবীদার। অথচ প্রকৃতপক্ষে তারা হক থেকে বহু দূরে। এগুলো উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে, যারা তাদের সাথে রয়েছে অথচ তাদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞ এবং আরো অন্যান্যরাও যেন তাদের ব্যাপারে সতর্ক

হতে পারে। আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি কতই না উত্তম অভিভাবক!

এ কথাগুলো বললেন ও লিখলেন লেখক যিনি আল্লাহ তা'আলার ক্ষমার মুখাপেক্ষী।

আব্দুর রহমান বিন হাম্মাদ আলে 'উমার
অধ্যাপক, আল-উলূমুদ দীনিয়্যাহ (ধর্ম বিজ্ঞান) বিভাগ।

প্রথম অধ্যায়: মহান স্রষ্টা আল্লাহর [১] পরিচয়

হে বিবেকবান মানুষ! জেনে রাখ! তোমাকে যে রব অনস্তিত্ব থেকে সৃষ্টি করেছেন, এবং তোমাকে নি'আমাতসমূহ দ্বারা প্রতিপালন করেছেন, তিনি হচ্ছেন আল্লাহ, রাব্বুল আলামিন। বিবেকবান মুমিনগণ আল্লাহ তা'আলাকে [২] চোখে দেখেনি; তবে তারা তার অস্তিত্ব এবং তিনি যে, সমস্ত সৃষ্টিজগতের পরিচালক তার ওপরে ইঙ্গিতকারী অকাট্য অনেক প্রমাণ দেখেছেন। ফলে তারা এর দ্বারা তাঁকে চিনতে পেরেছেন এবং স্বীকৃতি দিয়েছেন। আর এ সকল প্রমাণের মধ্যে রয়েছে:

প্রথম অকাট্য প্রমাণ:

সৃষ্টিজগত, মানুষ এবং জীবন: এগুলো সবই ক্ষণস্থায়ী বস্তু যাদের শুরু আছে এবং শেষ আছে। এরা অন্যের ওপরে নির্ভরশীল। ক্ষণস্থায়ী বস্তু এবং অপরের প্রতি মুখাপেক্ষি বস্তু অবশ্যই মাখলুক। আর মাখলুকের জন্য অবশ্যই একজন স্রষ্টা প্রয়োজন। আর এ মহান সৃষ্টিকর্তাই হচ্ছেন আল্লাহ। আর আল্লাহ তাঁর নিজের পবিত্র সত্তা সম্পর্কে নিজেই সংবাদ প্রদান করেছেন যে, তিনিই সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই সকল সৃষ্টি জগতের পরিচালক। এ সংবাদ আল্লাহর পক্ষ

থেকে তাঁর রাসূলদের ওপরে নাযিল করা গ্রন্থসমূহেই এসেছে।

আর আল্লাহর রাসূলগণ মানুষের কাছে তাঁর বাণী পৌঁছে দিয়েছেন। আর তাঁর প্রতি ঈমান আনা এবং এককভাবে শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদত করার প্রতি আহ্বান করেছেন। আল্লাহ তাঁর মহান কিতাব কুরআনে বলেছেন:

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُعْشَىٰ لَيْلَ النَّهَارِ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسْحَرَاتٍ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٤﴾﴾

[الأعراف: 54]

“নিশ্চয় তোমাদের রব আল্লাহ্ যিনি আসমানসমূহ ও যমীন ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন; তারপর তিনি আরশের উপর উঠেছেন। তিনিই দিনকে রাত দিয়ে ঢেকে দেন, তাদের একে অন্যকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে। আর সূর্য, চাঁদ ও নক্ষত্ররাজি, যা তাঁরই হুকুমের অনুগত, তা তিনিই সৃষ্টি করেছেন। জেনে রাখ, সৃষ্টি ও আদেশ তাঁরই। সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ্ কত বরকতময়!” [সূরা আল-আরাফ, আয়াত: ৫৪]

আয়াতে কারীমাহর সংক্ষিপ্ত অর্থ:

আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মানুষকে সংবাদ প্রদান করেছেন যে, তিনি তাদের রব, যিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, এবং আসমান ও যমীনকে সৃষ্টি করেছেন ছয়দিনে।[৩] তিনি আরো সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি আরশের উপরে উঠেছেন।

আরশ আসমানসমূহের উপরে অবস্থিত। সৃষ্টির মধ্যে এটি সবচেয়ে উর্ধ্ব এবং বিস্তৃত মাখলুক। আর আল্লাহ এ আরশেরই উপর। অথচ তিনি তাঁর জ্ঞান, শোনা ও দেখার মাধ্যমে সমস্ত সৃষ্টিকুলের সাথেই রয়েছেন। তাদের কর্মকাণ্ডের মধ্য হতে তাঁর কাছে কোন বস্তুই গোপন থাকে না। আল্লাহ -জাল্লা শানুহু- সংবাদ দিয়েছেন: তিনি দিনকে রাতের অন্ধকার দ্বারা ঢেকে দেন এবং দ্রুত গতিতে সে তার অনুসরণ করে। তিনি আরো সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি সূর্য, চাঁদ ও নক্ষত্রসমূহ সৃষ্টি করেছেন। এবং এগুলোকে তিনি অধীনস্ত করে রেখেছেন, আর আল্লাহর আদেশে এরা নিজেদের কক্ষপথে চলতে থাকে। তিনি আরো সংবাদ দিয়েছেন যে, সৃষ্টি ও আদেশ শুধুমাত্র তাঁরই। আর তিনিই সত্তাগত ও সিফাতগতভাবে পরিপূর্ণ এবং মহান। যিনি স্থায়ী অগণিত উত্তমবস্তু দান করেছেন, আর তিনিই সৃষ্টিজগতের রব, যিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তাদেরকে নি'আমতসমূহ দ্বারা প্রতিপালন করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেন,

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ
وَأَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ [فصلت: 37]

“আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে রাত ও দিন, সূর্য ও চাঁদ। তোমরা সূর্যকে সিজদা করো না, চাঁদকেও নয়; আর সিজদা কর আল্লাহকে, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা কেবলমাত্র তাঁরই ইবাদত কর।”
[সূরা ফুসসিলাত, আয়াত: ৩৭]

আয়াতে কারীমাহর সংক্ষিপ্ত অর্থ:

আল্লাহ তাআলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, তাঁর ব্যাপারে প্রমানবহনকারী নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে: রাত, দিন, সূর্য ও চাঁদ। তিনি চাঁদ-সূর্যকে সিজদা করতে নিষেধ করেছেন; কেননা তারা উভয়েই অন্যান্য মাখলূকের মত মাখলূক। আর মাখলূকের ইবাদাত করা সঠিক নয়। সিজদা: এক প্রকারের ইবাদাত, আল্লাহ তাআলা এ আয়াত ও অন্যান্য আয়াতে মানুষকে আদেশ করেছেন যে: তারা যেন শুধুমাত্র আল্লাহকেই সিজদা করে; কেননা তিনিই সৃষ্টিকর্তা, পরিচালনাকারী এবং ইবাদাতের একমাত্র উপযুক্ত।

দ্বিতীয় অকাট্য প্রমাণ:

তিনি পুরুষ ও মহিলা সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং পুরুষ ও নারীর অস্তিত্ব আল্লাহর অস্তিত্বের ওপরই প্রমাণ।

তৃতীয় অকাট্য প্রমাণ:

ভাষা ও বর্ণের পার্থক্য: দুজন ব্যক্তি এমন পাওয়া যাবে না যাদের কণ্ঠ এক, তাদের উভয়ের গায়ের বর্ণও এক। বরং এদের মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য থাকে।

চতুর্থ অকাট্য প্রমাণ:

ভাগ্যের ভিন্নতা: একই সময়ে কেউ ধনী, আবার কেউ গরীব। কেউ নেতা, আবার কেউ প্রজা। অথচ তাদের প্রত্যেকেই বিবেকের অধিকারী, জ্ঞানসম্পন্ন, চিন্তাশীল এবং তাদের প্রত্যেকেই যা অর্জিত হয়নি এমন বিষয়ের প্রতি আগ্রহী, যেমন: ধন-সম্পদ, মান-মর্যাদা ও সুন্দরী স্ত্রী ইত্যাদি। তবে কেউই তার নিজ ইচ্ছায় এগুলো অর্জন করতে পারে না, শুধু ঐটুকু ছাড়া-

যতটুকু আল্লাহ তার জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। এর পিছনে আল্লাহ সুবহানাল্ [৫] ওয়া তাআলার ইচ্ছানুযায়ী অনেক বড় একটি হিকমাত রয়েছে, আর তা হচ্ছে: কতিপয় মানুষের দ্বারা অন্যদের পরীক্ষা করা, এবং একজন

অন্যজনের সেবা করা ইত্যাদি, যেন তাদের সকলের সুবিধার দিকগুলো ঠিক থাকে।

তবে দুনিয়াতে আল্লাহ যার অংশ নির্দিষ্ট করেননি, তার ব্যাপারে আল্লাহ জানিয়েছেন যে, তার অংশ জান্নাতের মধ্যে বর্ধিত নি'আমাত আকারে জমা করে রাখা হবে। যখন সে ব্যক্তি আল্লাহর ওপরে ঈমান রেখে মারা যাবে। এছাড়াও আল্লাহ দরিদ্র ব্যক্তিদেরকে এমন কতিপয় বৈশিষ্ট্য দান করেছেন, যা তারা সাধারণত শারীরিক ও মানসিকভাবে উপভোগ করে থাকে, অথচ তা অধিকাংশ ধনীদের ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না। এটা আল্লাহর হিকমাত ও ইনসাফ।

পঞ্চম অকাট্য প্রমাণ:

ঘুম ও সত্য স্বপ্ন, যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা ঘুমন্ত ব্যক্তিকে সুসংবাদ অথবা সতর্ককরন হিসেবে গায়েবের কতিপয় বিষয় সম্পর্কে জানান দেন।

ষষ্ঠ অকাট্য দলীল:

ক্বাহ: এর বাস্তব স্বরূপ সম্পর্কে একক আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।

সপ্তম অকাট্য প্রমাণ:

মানুষ: তার শরীরে থাকা ইন্দ্রিয়, স্নায়ুতন্ত্র, মস্তিষ্ক, পরিপাকতন্ত্র ইত্যাদি।

অষ্টম অকাট্য প্রমাণ:

আল্লাহ তা'আলা আসমান থেকে মৃত যমীনের উপরে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, আর তাতে যমীন থেকে উদ্ভিদ ও গাছপালা উৎপাদিত হয়, যা রঙ-বেরঙের ও বিভিন্ন রূপের, গুণাগুণ সমৃদ্ধ ও বিভিন্ন স্বাদের হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক কুরআনে উল্লেখিত শত শত প্রমাণের মধ্য হতে এ কটি খুব সামান্য প্রমাণ, যেগুলোর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব রয়েছে এবং তিনিই সৃষ্টিজগতে বিদ্যমান সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা ও পরিচালক।

নবম অকাট্য প্রমাণ:

ফিতরাত (স্বভাব), যার উপরে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। এ স্বভাবই তার একজন সৃষ্টিকর্তা ও পরিচালকের ওপর ঈমান রাখে। আর যে এটিকে অস্বীকার করে, সে মূলত নিজেকে দুর্দশা ও বিভ্রান্তির মধ্যে নিষ্ক্ষেপ করে থাকে। সুতরাং সাম্যবাদী (কমিউনিস্ট) চিন্তাধারার অধিকারী [৬] ব্যক্তি এ দুনিয়াতেও সে দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে থাকে, আর মৃত্যুর পরেও তার পরিণতি হবে জাহান্নাম। আর তা

হবে তার রবকে অস্বীকার করার মন্দ পরিণতি, যে রব তাকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এনেছেন, এরপরে তাকে নি‘আমাত দ্বারা প্রতিপালন করেছেন। তবে যদি সে আল্লাহর কাছে ফিরে আসে (তাওবা করে), আর তাঁর প্রতি, তাঁর দীন ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনে, তাহলে ভিন্ন কথা।

দশম অকাট্য প্রমাণ:

বরকত, এটি হচ্ছে কতিপয় সৃষ্টির মধ্যে আধিক্যতা, যেমন: ছাগল ইত্যাদিতে। আর বরকতের বিপরীত হচ্ছে ব্যর্থতা বা শেষ হয়ে যাওয়া, যেমন: কুকুর ও বিড়াল।

আল্লাহ তা‘আলার সিফাতের মধ্যে রয়েছে:

তিনিই প্রথম, তাঁর কোন শুরু নেই। তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী। তিনি মৃত্যুবরণ করবেন না আবার কখনো তিনি শেষও হবেন না। তিনি তাঁর সত্তাগতভাবেই অমুখাপেক্ষি। তিনি কারো প্রতি নির্ভরশীল নন। তিনিই এক, যার কোন শরীক নেই। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا

﴿أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: 4-1]

“বলুন, তিনি আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয় (১)” আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। (২) তিনি কাউকেও জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি (৩), ‘এবং তাঁর সমতুল্য কেউই নেই।’ (৪) [সূরা আল-ইখলাস, আয়াত: ১-৪]

আয়াতসমূহের অর্থ:

যখন কাফিররা সর্বশেষ নবী (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে আল্লাহর সিফাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল, তখন আল্লাহ এ সূরাটি নাযিল করেন। আর এতে তিনি তাদেরকে এ কথা বলার আদেশ করেন:

আল্লাহ এক, তাঁর কোন শরীক নেই। আল্লাহ চিরস্থায়ী চিরঞ্জীব ও সকল কিছুর পরিচালক। সৃষ্টিজগত, মানুষ ও অন্যান্য সকল কিছুর উপরেই তাঁর একচ্ছত্র মালিকানা। কোন সমস্যা সমাধানে শুধুমাত্র তাঁর কাছেই মানুষের ফিরে যাওয়া আবশ্যিক।

তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি। আর তাই এটা বলা শুদ্ধ হবে না যে, তাঁর কোন পুত্র, কন্যা, পিতা বা মাতা বা অনুরূপ কেউ আছে; বরং এ সূরা এবং অন্যান্য সূরাতেও তিনি তাঁর নিজের থেকে এ ব্যাপারটিকে অত্যন্ত কঠোরভাবে নাকচ করেছেন। কেননা, পরম্পরা রক্ষা ও জন্মদান মাখলূকের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তা‘আলা

খ্রীস্টানদের বক্তব্য: 'মাসীহ (ঈসা) আল্লাহর সন্তান' এবং ইহুদীদের বক্তব্য 'ঊযাইর আল্লাহর পুত্র' উভয়টিকে প্রত্যাখান করেছেন। এছাড়াও অন্যান্যদের বক্তব্য: 'ফেরেশতারা আল্লাহর কন্যা' এসব যারা বলেছে, তাদের এ ভিত্তিহীন কথাকে অত্যন্ত গর্হিত কাজ বলে অভিহিত করেছেন।

তিনি জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি মাসীহ ঈসা আলাইহিস সালামকে পিতা ছাড়াই মাতা থেকে স্বীয় ক্ষমতা বলে সৃষ্টি করেছেন। ঠিক যেভাবে তিনি মানুষের প্রথম পিতা আদাম 'আলাইহিস সালামকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছিলেন এবং যেভাবে মানুষের আদি মাতা হাওয়া 'আলাইহাস সালামকে আদাম 'আলাইহিস সালামের পাজর হতে সৃষ্টি করেছিলেন। এরপরে আদাম তাকে তার পাশে দেখেছিলেন। এরপরে তিনি আদামের সন্তানদেরকে সৃষ্টি করেছেন পুরুষ ও নারীর বীর্য হতে। আবার তিনি সকল বস্তুকে প্রারম্ভিক সৃষ্টিকালে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এনেছেন। এরপরে তিনি তাঁর সকল মাখলূকের জন্য এমন রীতি-নীতি ও ব্যবস্থার আয়োজন করেছেন, যা তিনি ছাড়া কেউ পরিবর্তন করতে সক্ষম নন। আর যদি আল্লাহ সুবহানাহ এ ব্যবস্থাপনা থেকে কোন কিছুকে পরিবর্তন করতে চান, তাহলে তিনি যেভাবে চান, তা সেভাবেই পরিবর্তন করতে পারেন।

অনুরূপভাবে তিনি ঈসা আলাইহিস সালামকে পিতা ছাড়াই মাতা থেকে সৃষ্টি করেছেন। এমনভাবে তিনি তাকে দোলনা থেকে কথা বলিয়ে ছিলেন এবং অনুরূপ তিনি মূসা আলাইহিস সালামের লাঠিকে জীবন্ত ছুটে চলা সাপে পরিণত করেছিলেন। আর মূসা যখনই উক্ত লাঠি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত করেছিলেন, তখনই তা এমন একটি বাজার সদৃশ প্রশস্ত রাস্তায় রূপান্তরিত হয়েছিল যে, তিনি ও তার কণ্ডম সেটির মধ্য দিয়ে সমুদ্র পার হয়েছিলেন। ঠিক যেভাবে তিনি সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত করে দিয়েছিলেন, এবং তিনি যখন গাছের পাশ যেতেন, গাছ তাকে সালাম জানাতো, প্রাণীদের মধ্যে কতিপয় তার রিসালাতের সাক্ষ্য দিয়েছিল এমন ভাষাতে, যা মানুষেরা শুনতে পেত, তা এভাবে: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি- আপনি আল্লাহর রাসূল এবং তিনি (আল্লাহ) তাকে বুরাকে করে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়েছিলেন, এরপরে তাকে আসমানে আরোহণ করিয়েছেন, তার সাথে ছিলেন জিবরীল আলাইহিস সালাম, যতক্ষণ না তিনি আসমানের উপরে পৌঁছে যান। এরপরে আল্লাহ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার সাথে কথা বলেছিলেন এবং তার উপরে সালাত ফরজ করেছিলেন। এরপরে তিনি যমীনে মসজিদে হারামে ফিরে আসেন এবং তিনি পৃথিবীতে সকল

আসমানের অধিবাসীদেরকে দেখেছিলেন। আর এ সব ছিল একটি মাত্র রাতে, ফজর উদিত হওয়ার আগেই। ইসরা ও মিরাজের ঘটনা কুরআন, হাদীসে রাসূল ও ইতিহাসের কিতাবের একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা।

আল্লাহর তা'আলা কর্তৃক তাঁর নিজের ব্যাপারে উল্লেখ করা এবং তাঁর রাসূলগণ তাঁকে যে গুণে গুণান্বিত করেছেন, উক্ত সিফাতসমূহের মধ্যে রয়েছে:

১- দেখা, শোনা, জ্ঞান, ক্ষমতা, ইচ্ছা করা। তিনি সবকিছুই দেখেন ও শোনে। তাঁর দেখা ও শোনার মধ্যে কোন বাধাদানকারী পর্দা নেই।

তিনি জানেন- যা জরায়ুতে রয়েছে, অন্তরসমূহ যা গোপন করে, যা হয়েছে এবং যা ভবিষ্যতে হবে। তিনিই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, যখন তিনি কোন বস্তুর ইচ্ছা করেন, তখন তিনি বলেন: হও, আর তা হয়ে যায়।

২- কথা বলা যা চান যখন চান: তিনি মূসা আলাইহিস সালামের সাথে কথা বলেছেন। তিনি শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কথা বলেছেন। কুরআন আল্লাহর কালাম, এর হরফ ও অর্থ সবই তাঁর পক্ষ হতে স্বীয় রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর নাযিল করেছেন। কুরআন আল্লাহর

সিফাতের মধ্য হতে একটি, কুরআন মাখলুক নয়, যেমনটি
ব্রাহ্ম মুতাযিলারা বলে[৭]

৩- চেহারা, দুই হাত, সমাসীন হওয়া, অবতরণ, [৮], সন্তুষ্ট
হওয়া এবং রাগ করা। তিনি তাঁর মুমিনদের ওপর সন্তুষ্ট হন
এবং কাফিরদের ওপর এবং তার রাগ উদ্বেককারী
বিষয়সমূহে লিপ্তদের উপর ক্ষুব্ধ হন। তাঁর রাগ ও সন্তুষ্ট
তাঁর অন্যান্য সিফাতসমূহের মতই, মাখলূকের সিফাতের
সাথে তুলনা করা যাবে না, কোন ব্যাখ্যাও করা যাবে না এবং
কোন ধরণ বর্ণনা করা যাবে না।

কুরআন ও সুন্নাহর দ্বারা প্রমাণিত, মুমিনরা আল্লাহ
তা'আলাকে তাদের নিজ চোখে সরাসরি কিয়ামাতের দিনে
এবং জান্নাতে দেখতে পাবে। আল্লাহর সিফাতগুলো
কুরআন ও রাসূলে করীমের হাদীসসমূহে বিস্তারিতভাবে
বর্ণিত আছে। প্রয়োজনে সেগুলো দেখে নিন।

যে কারণে আল্লাহ মানবসন্তান ও জিন সৃষ্টি করেছেন

হে বিবেকবান, যখন তুমি জানতে পারলে, আল্লাহ
তা'আলাই তোমার রব যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তখন
এটাও জেনে রেখ, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে অনর্থক সৃষ্টি
করেননি; বরং তোমাকে তাঁর ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি
করেছেন। এ কথার দলীল-আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُونِ ﴿٥٧﴾ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿٥٨﴾﴾
 [الذاريات: 56-58]

“আর আমি সৃষ্টি করেছি জিন এবং মানুষকে এজন্যেই যে, তারা কেবল আমার ইবাদাত করবে। আমি তাদের কাছ থেকে কোন রিষিক চাই না এবং এটাও চাই না যে, তারা আমাকে খাওয়াবে। নিশ্চয় আল্লাহ, তিনিই তো রিষিকদাতা, প্রবল শক্তিদর, পরাক্রমশালী।” [সূরা আয-যারিয়াত, আয়াত: ৫৬-৫৮]

আয়াতসমূহের সংক্ষিপ্ত অর্থ:

আল্লাহ তা‘আলা প্রথম আয়াতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি জিন [৯] ও মানব সন্তানকে এককভাবে তাঁরই ইবাদত করার উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। এরপরে দ্বিতীয় ও তৃতীয় আয়াতে তিনি বর্ণনা করেছেন, তিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি মুখাপেক্ষী নন। তাদের থেকে রিষিক চান না, খাদ্যও নয়। কেননা তিনিই তো শক্তিদর রিষিকদাতা, যার পক্ষ থেকেই মানুষ ও অন্যান্য সকলের রিষিক এসে থাকে। তিনিই বৃষ্টি নাযিল করেন এবং জমিন থেকে রিষিক বের করেন।

পক্ষান্তরে জমিনের অন্যান্য সকল মাখলূকের ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলা জানিয়েছেন, তিনি তাদেরকে সৃষ্টি

করেছেন মানুষের কল্যাণের জন্য; যাতে করে তারা সেগুলো দ্বারা আল্লাহর আনুগত্যের ব্যাপারে সহযোগিতা গ্রহণ করে এবং আল্লাহর নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী সেগুলোকে ব্যবহার করে। জগতের প্রতিটি মাখলুক, নড়াচড়া ও স্থিরতাকে আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বর্ণিত বিশেষ হিকমাতের নিমিত্তেই সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর শরী'আতের জ্ঞানীগণই তাদের জ্ঞান অনুযায়ী তা বুঝেন। এমনকি জীবনকাল, রিযিক, মুসীবত ও দুর্ঘটনাসমূহের ভিন্নতা সবই আল্লাহর আদেশ অনুযায়ীই হয়। যাতে তিনি তাঁর জ্ঞানী বান্দাদের পরীক্ষা করেন। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট, তাঁর অনুগত, তাঁর সন্তুষ্টি রয়েছে এমন আমল করার চেষ্টা করে, তার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে সন্তুষ্টি রয়েছে এবং রয়েছে দুনিয়া ও মৃত্যুর পরে আখিরাতে পরম সৌভাগ্য। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ফয়সালাতে সন্তুষ্ট নয়, তার জন্য অনুগত নয়, তাঁর আনুগত্যও করেনি, তার জন্য রয়েছে আল্লাহর পক্ষ হতে অসন্তুষ্টি এবং দুনিয়াতে ও আখিরাতে দুর্ভোগ।

আমরা আল্লাহর কাছে তাঁর সন্তুষ্টি চাই এবং তাঁর ক্রোধ থেকে পানাহ চাই।

মৃত্যুর পরে পুনরুত্থান, হিসাব গ্রহণ, আমলের প্রতিদান, জান্নাত ও জাহান্নাম

হে বিবেকবান মানুষ, যখন তুমি জানতে পারলে, আল্লাহ তোমাকে তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন, জেনে রেখো, আল্লাহ তাঁর রাসূলদগণের ওপর নাযিলকৃত কিতাবসমূহে সংবাদ দিয়েছেন যে, মৃত্যুর পরে অচিরেই তিনি তোমাকে জীবিত অবস্থায় প্রেরণ করবেন। আর মৃত্যুর পরে তোমাকে প্রতিদানের সময়কাল -কিয়ামাতের দিনে- তোমার আমলের প্রতিদান দিবেন। আর এটি এ কারণেই যে, মানুষ মৃত্যুর মাধ্যমে নশ্বর ও আমলের ক্ষেত্র এ দুনিয়া ছেড়ে চিরস্থায়ী প্রতিদানের জগতে -তথা মৃত্যু পরবর্তী জগতে- প্রবেশ করবে। যখন মানুষের আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে যাবে, তখন মৃত্যুর ফিরিশতা -মালাকুল মাওত-কে তার দেহ থেকে রূহ কবজের আদেশ করবেন, তখন তার দেহ থেকে রূহ বিচ্ছেদের আগে মৃত্যুর যন্ত্রণা উপলব্ধির পর সে মারা যাবে। রূহ (আত্মা), যদি সে মুমিন হয় এবং আল্লাহর অনুগত হয়, তাহলে রূহকে আল্লাহ দারুন নাঈম তথা জান্নাতে রাখবেন। আর যদি রূহ আল্লাহকে অস্বীকারকারী এবং পুনরুত্থান ও মৃত্যুর পরে প্রতিদান সম্পর্কে অবিশ্বাসী হয়, তাহলে তাকে আল্লাহ তা'আলা দারুল আযাব তথা জাহান্নামে রাখবেন। যতক্ষণ না দুনিয়া শেষ হয়ে কিয়ামাত কায়েম হবে, আর সকল অবশিষ্ট সৃষ্টিজীব মারা যাবে এবং

একক আল্লাহ ছাড়া কোন কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। তারপর আল্লাহ তা'আলা সকল সৃষ্টিকে প্রেরণ করবেন, এমনকি পশুপাখিকেও। আর প্রতিটি শরীরকে পূর্ণাঙ্গরূপে পুনরায় সুগঠিত করার পর সেখানে আল্লাহ রুহ ফিরিয়ে দেবেন, যেভাবে তিনি প্রথমবারে সৃষ্টি করেছিলেন। যাতে তিনি মানুষের কাছ থেকে হিসাব নেন এবং তাদের আমলসমূহের প্রতিদান দেন। হোক সে পুরুষ অথবা নারী, নেতা অথবা প্রজা, ধনী অথবা দরিদ্র। আল্লাহ কারো উপরে জুলুম করবেন না। জালিম বা অত্যাচারীর কাছ থেকে মাজলুম প্রতিশোধ নেবে। এমনকি পশু-প্রাণীরাও, যারা অন্যদের ওপর জুলুম করেছে, তাদের একে অপরের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিবেন। তারপর তাদেরকে বলা হবে: তোমরা মাটি হয়ে যাও; কেননা তারা জান্নাত বা জাহান্নাম কোনটিতেই প্রবেশ করবে না। মানুষ এবং জিন জাতির প্রত্যেককেই তার আমল অনুযায়ী প্রতিদান দিবেন। সুতরাং মুমিনরা, যারা আল্লাহর আনুগত্য করেছে এবং তাঁর রাসূলকে মেনে চলেছে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে; যদিও তারা সবচেয়ে দরিদ্র হয়ে থাকে। আর কাফির ও দীনেকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে; যদিও তারা দুনিয়াতে সবচেয়ে ধনী ও মানুষের মাঝে সন্মানিত হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿... إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾

[الحجرات: 13]

“নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সন্মানিত ব্যক্তি হচ্ছেন যিনি অধিক আল্লাহকে ভয় করে। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত।” [সূরা আল-হুজুরাতম আয়াত: ১৩]

জান্নাত: নি‘আমাতপূর্ণ আবাসন । তাতে এত নি‘আমাত রয়েছে যে, কোন ব্যক্তি তার বর্ণনা করতে পারবে না। সেখানে একশত স্তর রয়েছে, প্রতিটি স্তরের জন্য তাদের আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তাঁর আনুগত্যের উপরে ভিত্তি করে নির্দিষ্ট অধিবাসী রয়েছে। আর জান্নাতের সর্বনিম্ন স্তর, যা জান্নাতীদের দেওয়া হবে, তা দুনিয়ার সবচেয়ে উত্তম নি‘আমাত অপেক্ষা কয়েকগুণ বেশি হবে। [১০]

জাহান্নাম: -আল্লাহ আমাদেরকে সেখান থেকে মুক্তি দান করুন- এটি হচ্ছে মৃত্যুর পরে আখিরাতে আযাবপূর্ণ আবাসনের নাম। সেখানে বিভিন্ন প্রকারের আযাব ও শাস্তি রয়েছে, যার উল্লেখ করলে অন্তরসমূহ ভয়ে প্রকম্পিত হয়, আর চোখসমূহ কেঁদে ফেলে।

যদি আখিরাতে মৃত্যুর ব্যবস্থা থাকত, তাহলে জাহান্নামীরা জাহান্নামকে দেখামাত্রই মারা যেত। কিন্তু মৃত্যু তো মাত্র

একবারই হবে, যার দ্বারা মানুষ দুনিয়া থেকে আখিরাতে স্থানান্তর হয়। মৃত্যু, পুনরুত্থান, হিসাব-নিকাশ, প্রতিদান, জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে এবং আমরা যা ইঙ্গিত সহকারে বর্ণনা করেছি, সেগুলো কুরআন মাজীদে বিস্তারিতভাবে উল্লেখিত হয়েছে।

মৃত্যুর পরে পুনরুত্থান, হিসাব-নিকাশ ও প্রতিদান সংক্রান্ত দলীল-প্রমাণ প্রচুর রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেছেন:

﴿ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ۗ ﴾

[طه: 55]

“আমরা মাটি থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি , তাতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেব এবং তা থেকেই পুনর্বার তোমাদেরকে বের করব।” [সূরা ত্বহা, আয়াত: ৫৫]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন,

﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴾ [يس: 78]

[78]

“আর সে আমাদের সম্বন্ধে উপমা রচনা করে; অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়। সে বলে, 'কে অস্থিতে

প্রাণ সঞ্চার করবে যখন তা পচে গলে যাবে?” [সূরা ইয়াসিন: ৭৮-৭৯]

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [التغابن: 7]

“কাফিররা ধারণা করে যে, তাদেরকে কখনো পুনরুত্থিত করা হবে না। বলুন, ‘অবশ্যই হ্যাঁ, আমার রবের শপথ ! তোমাদেরকে অবশ্যই পুনরুত্থিত করা হবে। তারপর তোমরা যা করতে সে সম্বন্ধে তোমাদেরকে অবশ্যই অবহিত করা হবে। আর এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ।” [সূরা আত-তাগাবুন: ০৭]

আয়াতসমূহের সংক্ষিপ্ত অর্থ:

১- প্রথম আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমিন (মাটি) থেকে। আর এটি মূলত যখন তাদের পিতা আদাম আলাইহিস সালামকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি আরো সংবাদ দিচ্ছেন যে, মানুষকে তিনি মৃত্যুর পরে -তাদের সম্মানের কারণে- সেখানে তথা কবরের মধ্যে আবার ফিরিয়ে নিবেন। তিনি আরো সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনি তাদেরকে সেখান থেকে

দ্বিতীয়বার আবারো বের করবেন। তখন তারা -প্রথম থেকে সর্বশেষ ব্যক্তি পর্যন্ত সকলকেই- তাদের কবর থেকে জীবিত অবস্থায় বের করবেন। তারপরে আল্লাহ তাদের হিসাব গ্রহণ করবেন এবং তারপরে তাদেরকে প্রতিদান দিবেন।

২- দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ তা'আলা পুনরুত্থানকে অস্বীকারকারী ও হাড় ধংস হয়ে যাওয়ার পরে আবার তাকে জীবিত করার ব্যাপারে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীর জবাব প্রদান করেছেন। তিনি এ সংবাদের মাধ্যমে জবাব দিয়েছেন, তিনি তাকে জীবিত করবেন; যেহেতু তিনিই তাকে প্রথমবার অনস্তিত্ব থেকে অনস্তিত্বে নিয়ে এসেছিলেন।

৩- তৃতীয় আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মৃত্যুর পরে পুনরুত্থানকে অস্বীকারকারী কাফির মিথ্যুকদের বাতিল (ভিত্তিহীন) ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করছেন। আর তিনি তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আদেশ করেছেন এ ব্যাপারে নিশ্চিত কসম করতে যে, অচিরেই আল্লাহ তাদের পুনরুত্থান ঘটাবেন এবং অচিরেই তাদেরকে তাদের কৃত আমল সম্পর্কে তিনি অবহিত করবেন। আর তাদেরকে আমল অনুযায়ী তিনি প্রতিদান দিবেন। আর এটা আল্লাহর জন্য খুবই সহজ।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরো সংবাদ দিয়েছেন যে, যখন তিনি জাহান্নাম ও পুনরুত্থান সম্পর্কে মিথ্যা

প্রতিপন্নকারীদেরকে পুনরুত্থিত করবেন, তখন তাদেরকে তিনি জাহান্নামের আগুনে শাস্তি দিবেন, আর তাদেরকে বলা হবে:

﴿..... ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهِء تَكْذِبُونَ﴾ [السجدة: 20]

“তোমরা জাহান্নামের শাস্তি আশ্বাদন কর, যাকে তোমরা মিথ্যা মনে করত।” [সূরা আস-সাজদাহ: ২০]

মানুষের কথা ও কাজের সংরক্ষণ:

আল্লাহ তা'আলা আরও সংবাদ দিয়েছেন যে, প্রতিটি মানুষ গোপনে কিংবা প্রকাশ্যে ভালো অথবা মন্দ যেটাই করবে, তা তিনি পূর্ব থেকেই জানেন। তিনি আরও সংবাদ দিয়েছেন যে, আসমান, জমিন, মানুষ ও অন্যান্য সৃষ্টজীবকে সৃষ্টি করার আগেই তিনি সেগুলোকে নিজের কাছে লাওহে মাহফূযে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। তিনি আরও সংবাদ দিয়েছেন যে, এর সাথে তিনি প্রতিটি মানুষের জন্য দু'জন ফিরিশতাকে দায়িত্ব প্রদান করেছেন, একজন মানুষের ডানে সে ভালো কাজগুলো লিপিবদ্ধ করেন, আর অপরজন তার বামে সে পাপ কাজগুলো লিপিবদ্ধ করেন। তাদের কাছ থেকে কোন কিছুই বাদ যায় না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরও সংবাদ দিয়েছেন যে, প্রতিটি মানুষকে হিসাবের দিনে (কিয়ামাত) তার লিপিবদ্ধ কথা ও

কাজের উক্ত আমলনামা দেওয়া হবে, তারপরে সে তা পাঠ করবে, আর সে তার কোন কিছুই অস্বীকার করতে পারবে না। আর যে ব্যক্তি তা থেকে কোন কিছুকে অস্বীকার করবে, আল্লাহ তার কান, চোখ, দুই হাত, দুই পা ও চামড়ার মাধ্যমে কথা বলিয়ে তার সকল কর্ম প্রকাশ করাবেন।

মহিমান্বিত কুরআনে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা এসেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ [ق: 18]

“সে যে কথাই উচ্চারণ করে তার কাছে সদা উপস্থিত সংরক্ষণকারী রয়েছে।” [সূরা ক্বাফ : ১৮]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেন,

﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۝ كِرَامًا كَاتِبِينَ ۝ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾

[الانفطار: 10-12]

“আর নিশ্চয় তোমাদের উপরে নিয়োজিত আছেন সংরক্ষকদল। সম্মানিত লেখকবৃন্দ। তারা জানেন তোমরা যা কর।” [সূরা আল-ইনফিত্বার: ১০-১২]

আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা:

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সংবাদ দেন যে, তিনি প্রতিটি মানুষের সাথে দু'জন করে ফিরিশতা নিয়োগ করেছেন। একজন তার ডানে পর্যবেক্ষক, নেক কাজগুলো লিপিবদ্ধ করেন। আর অপরজন তার বামে থেকে সংরক্ষক, তার পাপসমূহকে লিপিবদ্ধ করেন। শেষ দুটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরও সংবাদ প্রদান করেছেন, মানুষের জন্য তিনি আরো অসংখ্য সম্মানিত ফিরিশতা নিযুক্ত করেছেন, যারা তাদের সব আমল লিপিবদ্ধ করেন। তিনি আরো সংবাদ প্রদান করেছেন যে, আল্লাহ মানুষের সব আমল সম্পর্কে জানেন এবং তিনি তাদেরকে কাজ করার সক্ষমতা দিয়েছেন। আর তিনি মানুষ সৃষ্টির আগেই তাদের যাবতীয় কর্ম নিজের কাছে লাওহে মাহফুযে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন।

সাক্ষ্যদান:

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, আর কিয়ামাত সংঘটিত হবেই, এতে কোন সন্দেহ নেই এবং যারা কবরে আছে তাদেরকে হিসাব-নিকাশ ও প্রতিদানের জন্য নিশ্চয় আল্লাহ পুনরুত্থিত করবেন। আর আল্লাহ তাঁর কিতাবে অথবা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষাতে যা জানিয়েছেন, তার সবটুকুই সত্য।

হে বিবেকবান! আমি তোমাকে এ শাহাদাতের প্রদি ঈমান
আনা, তা প্রকাশ করা ও তার অর্থ অনুযায়ী আমল করার
প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। আর এটিই মুক্তির পথ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে জানা

হে বিবেকবান মানুষ! যখন তুমি জানতে পারলে যে, আল্লাহই তোমার রব যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। আর অচিরেই তিনি তোমাকে তোমার আমল অনুযায়ী প্রতিদানের জন্য পুনরুত্থিত করবেন। তাহলে তুমি এটাও জেনে রেখো যে, তুমিসহ সকল মানুষের কাছেই আল্লাহ একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন। আর তিনি তোমাকে আদেশ করেছেন তাঁর অনুসরণ ও আনুগত্য করার জন্য। আর তুমি আরো জেনে রেখো যে, বিশুদ্ধ ইবাদতের পন্থা-পদ্ধতি শুধু এই রাসূলের অনুসরণের মধ্যেই রয়েছে। আর আল্লাহ যে শারী'আতসহ রাসূলকে প্রেরণ করেছেন সে অনুযায়ী আল্লাহর ইবাদাত করতে হবে।

আর এই সম্মানিত রাসূলের প্রতি সকল মানুষের ঈমান আনা ও তার অনুসরণ করা ফরয। তিনি রাসূলগণের মধ্যে সর্বশেষ রাসূল। তিনি সকল মানুষের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা রাসূল, উম্মী নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। যার ব্যাপারে তাওরাত ও ইঞ্জিলে মূসা ও ইসা আলাইহিমাস সালাম চল্লিশ থেকেও বেশী স্থানে সুসংবাদ দিয়েছিলেন। এসব সুসংবাদ ইহুদী ও খৃস্টান সম্প্রদায়ের

লোকেরা তাদের কিতাবদ্বয় নিয়ে প্রতারণা শুরু করা ও তা পরিবর্তন করে ফেলার আগ পর্যন্ত তেলাওয়াত করত। [১১]

আর এ সম্মানিত রাসূল, যার মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর রাসূলদের ধারাবাহিকতা সমাপ্ত করেছেন। যাকে সকল মানুষের কাছে নবী হিসেবে পাঠিয়েছেন। তিনি হচ্ছেন মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুল মুত্তালিব আল-হাশিমী আল-কুরাইশী -সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-। যিনি পৃথিবীর সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত বংশের, সবচেয়ে সম্মানিত ও সত্যবাদী মানুষ। তিনি আল্লাহর নবী ইবরাহীম তনয় আল্লাহর নবী ইসমাঈল আলাইহিমুস সালামের বংশধর। সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কাতে ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। যে রাতে এবং যে মুহুর্তে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তখন তার মায়ের পেট থেকে একটি তীব্র আলো বের হয়ে জগতকে আলোকিত করেছিল। আর মানুষ এতে অবাক হয়ে গিয়েছিল, যা ইতিহাসের গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ রয়েছে। মক্কার কা'বা ঘরে রাখা কুরাইশদের ইবাদতের মূর্তিগুলো উল্টে গিয়েছিলো। পারস্যের অধিপতি কিসরার দরবার কক্ষ কেপে উঠেছিল। প্রায় সতেরটি গম্বুজ ভেঙ্গে পড়েছিল। পারস্যের অধিবাসীদের ইবাদাতের জন্য প্রজ্জ্বলিত শিখা-চিরন্তনী নিভে গিয়েছিল, যা এর আগে দীর্ঘ দু'হাজার বছরে কখনো নিভেনি।

এগুলো সবই ছিল আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে জমিনবাসীদের জন্য সর্বশেষ নবীর আগমন সংক্রান্ত ঘোষণাস্বরূপ। যিনি অচিরেই আল্লাহ ব্যতীত ইবাদাতকৃত সকল মূর্তিগুলোকে ধ্বংস করবেন, পারস্য ও রোমকে এক আল্লাহর ইবাদাত ও তাঁর দীনের মধ্যে প্রবেশের দিকে আহ্বান জানাবেন। যদি তারা তা মানতে অস্বীকার করে থাকে, তবে তিনি নিজে এবং তার অনুসারীগণ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবেন, আর আল্লাহ তাদের বিরুদ্ধে নবী ও তার অনুসারীদেরকে সাহায্য করবেন এবং তিনি তাঁর দীনকে প্রসারিত করবেন, যে দীন হচ্ছে দুনিয়ার বুকে তাঁর [পক্ষ হতে আগত] আলো বা নূর। আর আল্লাহ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর রাসূল হিসেবে প্রেরণ করার পরে এগুলো সবই অর্জিত হয়েছিলো।

আল্লাহ তা'আলা সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অন্যান্য রাসূলদের থেকে বিশেষ কিছু মর্যাদা প্রদান করেছিলেন, যার মধ্যে রয়েছে:

প্রথমত: তিনিই সর্বশেষ রাসূল। তার পরে কোন নবী অথবা অন্য কোন রাসূল আসবেন না।

দ্বিতীয়ত: তাঁর রিসালাত সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য। সুতরাং সকল মানুষই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মাতভুক্ত। যে তাকে অনুসরণ করবে, সে

জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে তার অবাধ্য হবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। এমনকি ইহুদী ও খৃস্টানরাও তার অনুসরণ করতে বাধ্য। আর তাদের মধ্য হতে যারা তার অনুসরণ করে না এবং ঈমান আনবে না, সে মূলত মূসা ও ঈসাসহ সকল নবীদেরকেই অস্বীকারকারী কাফির।। যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুসরণ করে না, মূসা ও ঈসাসহ সকল নবী আলাইহিমুস সালাম এমন লোকদের থেকে সম্পূর্ণ দায়মুক্ত। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আদেশ করেছেন যে, তারা যেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে তাদের উম্মাতদেরকে সুসংবাদ দেয় এবং নবী হিসেবে তাকে প্রেরণের পরে তার অনুসরণের ব্যাপারে তাদেরকে আহ্বান জানান। যেহেতু যে দীন সহকারে আল্লাহ তাকে প্রেরণ করেছেন, তা এমন দীন, যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাঁর সমস্ত রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছিলেন। আর সে দীনের পরিপূর্ণতা ও সহজ হওয়ার ব্যাপার পূর্ণতা লাভ করেছে এ সম্মানিত রাসূল ও শেষ নবীর সময়ে। সুতরাং কোন ব্যক্তির জন্য বৈধ হবে না যে, সে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়ত লাভের পরে তাঁর মাধ্যমে প্রেরিত ইসলাম ধর্ম ছাড়া অন্য কোন ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত থাকা। কেননা ইসলামই এমন পরিপূর্ণ দীন, যার দ্বারা আল্লাহ

সকল দীনকে রহিত করে দিয়েছেন, আর এটিই একমাত্র সংরক্ষিত সত্য দীন।

ইহুদী ও খৃস্টান ধর্ম বর্তমানে একটি বিকৃত (মূল থেকে পরিবর্তিত) দীন, যা বাস্তবিকপক্ষে আল্লাহর নাযিলকৃত দীন নয়। সুতরাং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণকারী প্রতিটি মুসলিম মূসা, ঈসা ও সকল নবী আলাইহিমুস সালামের অনুসারী বিবেচনা করা হবে। আর ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়া ব্যক্তি মূসা, ঈসা ও সকল নবী আলাইহিমুস সালামদেরকে অস্বীকারকারী গন্য করা হবে। যদিও সে দাবী করে, সে মূসা অথবা ঈসা আলাইহিমাস সালামের অনুসারী।

আর এ কারণে একদল জ্ঞানী ও ন্যায়পরায়ন ইহুদী পণ্ডিত ও খৃস্টান পাদ্রী দ্রুত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান এনেছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুজিযাসমূহ [১২]

সীরাতের আলিমগণ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতের সত্যতার ওপর মুজিযাসমূহকে

গণনা করেছেন, যার সংখ্যা এক হাজারেরও বেশী। তন্মধ্যে রয়েছে:

১- মোহরে নুওয়ত, যা আল্লাহ তার দুই কাঁধের মাঝখানে স্থাপন করেছিলেন। তা ছিল: **محمد رسول الله** অর্থ্যাৎ: মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। যার আকৃতি ছিল বড় একটি আঁচিলের ন্যায়। [১৩]

২- গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরমে তিনি যখন হাঁটতেন, তখন মেঘমালা তাঁকে ছায়াদান করতো।

৩- তার দুই হাতে থাকা নুড়ি পাথরের তাসবীহ পাঠ এবং বৃক্ষ তার কাছে আত্মসমর্পণ করা।

৪- শেষ যামানায় সংঘটিতব্য গায়িবের বিষয় সম্পর্কে তার ভবিষ্যদ্বাণী। আর সেগুলো তিনি যেভাবে সংবাদ প্রদান করেছেন, সেভাবেই একের পর এক ঘটে চলেছে।

আর এ সকল গায়িবের বিষয় ঘটবে সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ **সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের** মৃত্যুর পর থেকে দুনিয়ার শেষদিন পর্যন্ত। যা আল্লাহ তা'আলা তাকে জানিয়েছিলেন এবং তিনি সংবাদ দিয়েছেন, যেগুলো হাদীসের কিতাব ও কিয়ামাতের আলামত সংক্রান্ত গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ রয়েছে। যেমন: ইবনু কাছীরের 'আন-নিহায়াহ', 'আখবারুল মুশাআহ ফী আশরাতিস সা'আহ',

এবং হাদীসের কিতাবের মধ্যে 'আবওয়াবুল ফিতানি ওয়াল মালাহিম' ইত্যাদি গ্রন্থে। আর এ সকল মুজিযাসমূহ তার পূর্বে আসা নবীদের মুজিযার সদৃশ।

কিন্তু তাকে আল্লাহ তা'আলা এমন একটি জ্ঞানগত ও যুগের পর যুগ ধরে স্থায়ী মুজিযার মাধ্যমে বিশেষায়িত করেছেন, যা দুনিয়ার শেষদিন পর্যন্ত থাকবে। আর এমন মুজিযা আল্লাহ ইতোপূর্বে অন্য কোন নবীকেই প্রদান করেননি। তা হচ্ছে: আল্লাহর বাণী, মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। যা রক্ষার দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ গ্রহণ করেছেন। কোন বিকৃতকারীর হাত সেখানে পৌঁছতে পারবে না। যদি কেউ এর একটি হরফও পরিবর্তন করতে চেষ্টা করে, তাহলে তা ধরা পড়ে যাবে। আর এই তো মুসলিমদের হাতে লক্ষ লক্ষ কপি কুরআনের মুসহাফ রয়েছে, যার কোনটিই অন্যটি থেকে ভিন্ন নয়। এমনকি একটি হরফও নয়।

পক্ষান্তরে তাওরাত ও ইঞ্জিলের কপি অসংখ্য, আর সেগুলো একটির সাথে অন্যটির পার্থক্যও অনেক। কেননা ইহুদী ও খৃস্টানরা এ দুটি গ্রন্থ নিয়ে খেলাতে লিপ্ত হয়েছে। এ দুটির সংরক্ষণের দায়িত্ব আল্লাহ তাদের উপরে ছেড়ে দিলেও তারা এগুলো বিকৃত করে ফেলেছে। কিন্তু কুরআন সংরক্ষণের বিষয়টি তিনি অন্যের উপরে ছেড়ে দেননি; বরং আল্লাহ সুবহানাল্ ওয়া তা'আলা স্বয়ং এটিকে সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেছেন:

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٩﴾﴾ [الحجر: 9]

“নিশ্চয় আমরাই কুরআন নাযিল করেছি এবং আমরা অবশ্যই তার সংরক্ষক।” [সূরা আল-হিজর, আয়াত: ৯]

যুক্তিভিত্তিক অকাট্য প্রমাণ এবং আল্লাহ তা‘আলার বাণী হতে কুরআন আল্লাহর বাণী এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল হওয়ার ওপর দলীলসমূহ।

কুরআন আল্লাহর বাণী এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল এ ব্যাপারে যুক্তি ভিত্তিক অন্যতম একটি প্রমাণ হচ্ছে: আল্লাহ তা‘আলা কুরাইশ কাফিরদেরকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন, যখন তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিথ্যে প্রতিপন্ন করেছিল, যেমনভাবে পূর্ববর্তী উস্মাতগণ তাদের নবীদেরকে মিথ্যে প্রতিপন্ন করেছিল। আর তারা বলেছিল: “কুরআন আল্লাহর বাণী নয়।” তখন আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে আল-কুরআনের ন্যায় অনুরূপ একটি গ্রন্থ আনায়ন করতে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। যদিও এ কুরআন তাদের ভাষায়ই অবতরণ হয়েছিল এবং তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলো সবচেয়ে বিশুদ্ধভাষী, বড় বড় সুবক্তা, বাগ্মী ও কবিসাহিত্যিক ছিল; তবুও তারা এ ব্যাপারে অক্ষম হয়েছিল। তারপরে আল্লাহ তাদেরকে আল-কুরআনের ন্যায় অনুরূপ দশটি সূরা রচনা করতে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। সেখানেও

তারা অক্ষম হয়েছিল। অতপর আল্লাহ তাদেরকে অনুরূপ একটি সূরা রচনা করতে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। সেখানেও তারা অক্ষম হয়েছিল। তারপরে তিনি তাদের অক্ষমতা সম্পর্কে ঘোষণা করে দিয়েছেন। সকল জিন এবং ইনসানও অনুরূপ গ্রন্থ আনায়ন করতে অপারগ, যদিও তারা সকলেই একে অপরের সাহায্যকারী হয়ে যায়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন:

﴿قُلْ لَّيْنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْحَيُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ ۚ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ [الإسراء: 88]

“বলুন, যদি কুরআনের অনুরূপ কুরআন আনার জন্য মানুষ ও জিন সমবেত হয় এবং যদিও তারা পরস্পরকে সাহায্য করে তবুও তারা এর অনুরূপ আনতে পারবে না। [সূরা আল-ইসরা: আয়াত: ৮৮]

সুতরাং কুরআন যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অথবা অন্য কোন ব্যক্তির বাণী হত, তাহলে তিনি ছাড়াও এ ভাষার অন্যান্য বাগ্মীরা কুরআনের অনুরূপ সূরা রচনা করতে সক্ষম হতো।

কিন্তু কুরআন হচ্ছে: আল্লাহর বাণী। আর আল্লাহর বাণীর মহত্ব ও উচ্চতা মানুষের কথা হতে ঠিক ততটাই বেশী, যতটা মানুষের ওপরে আল্লাহর মহত্ব রয়েছে।

আর আল্লাহর যেমন কোন তুলনা নেই, ঠিক তেমন তাঁর কালামেরও কোন তুলনা নেই। এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কুরআন আল্লাহর বাণী এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। যেহেতু আল্লাহর বাণী তাঁর পক্ষ থেকে রিসালাতপ্রাপ্ত রাসূলের মাধ্যমেই আসে। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ﴾

[وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٤٠﴾] [الأحزاب: 40]

“মুহাম্মাদ তোমাদের কোন পুরুষের পিতা নন; তবে আল্লাহর রাসূল ও সর্বশেষ নবী। আর আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞ।” [সূরা আল-আহযাব: আয়াত: ৪০]

আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾﴾

[سبأ: 28]

“আর আমরা তো আপনাকে সমগ্র মানুষের জন্যই সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।” [সূরা সাবা, আয়াত: ২৮]

আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾﴾ [الأنبياء: 107]

“আর আমরা তো আপনাকে সৃষ্টিকুলের জন্য শুধু রহমতরূপেই পাঠিয়েছি।” [সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত : ১০৭]

আয়াতসমূহের সংক্ষিপ্ত অর্থ:

১- আল্লাহ তা‘আলা প্রথম আয়াতে সংবাদ দিয়েছেন যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল মানুষের কাছে তাঁর পক্ষ হতে প্রেরিত রাসূল। তিনিই তাঁর সর্বশেষ নবী। তারপরে আর কোন নবী নেই। তিনি আরো সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি তাঁকে (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে) তাঁর রিসালাত বহন করা ও শেষ নবী হওয়ার জন্য মনোনিত করেছেন। কারণ, তিনি জানেন, তিনিই উক্ত কাজের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি।

২- আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা দ্বিতীয় আয়াতে জানিয়েছেন যে, তিনি তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাদা কালো, আরব অনারব সকল মানুষের নিকট প্রেরণ করেছেন। তিনি আরো জানিয়েছেন যে, অধিকাংশ মানুষই হক সম্পর্কে অজ্ঞ। ফলে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ না করার কারণে তারা পথভ্রষ্ট ও কাফির।

৩- আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তৃতীয় আয়াতে সম্বোধন করে সংবাদ দিয়েছেন, তিনি তাঁকে (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে) সমগ্র পৃথিবীর জন্য রহমত হিসেবে পাঠিয়েছেন। সুতরাং তিনি আল্লাহর রহমত যদ্বারা তিনি তাকে মানুষের ওপর সম্মানিত করেছেন। যে তার ওপর ঈমান আনবে এবং তার অনুসরণ করবে, সে আল্লাহর উক্ত রহমতকে গ্রহণ করল। আর তার জন্য রয়েছে জান্নাত। আর যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে ঈমান আনল না ও তাঁকে অনুসরণ করল না, সে আল্লাহর রহমতকে প্রত্যাখ্যান করল, সে জাহান্নাম ও যন্ত্রনাদায়ক আযাবের উপযুক্ত হল।

আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমানের আহবান:

হে বিবেকবান, এ কারণে আমরা তোমাকে রব হিসেবে আল্লাহর প্রতি এবং রাসূল হিসেবে তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনার আহবান জানাচ্ছি। আরও আহ্বান জানাচ্ছি যে, তাঁর অনুসরণ করা এবং যে শরী'আত সহকারে আল্লাহ তাকে পাঠিয়েছেন তদনুযায়ী আমল করার প্রতি। আর তা হলো ইসলাম ধর্ম, যার উৎস হচ্ছে মহিমান্বিত কুরআন -আল্লাহর বাণী- এবং শেষ রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত হাদীসসমূহ। কেননা, আল্লাহ তাঁকে নিষ্পাপ করেছেন। ফলে তিনি আল্লাহর আদেশ ছাড়া অন্য কোন আদেশ দেন না এবং আল্লাহ যা থেকে নিষেধ করেছেন, তা থেকেই কেবল তিনি নিষেধ করেছেন। অতএব তুমি একনিষ্ঠ হৃদয়ে বল: আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি, তিনি আমার রব ও একক ইলাহ। তুমি আরও বল: আমি ঈমান এনেছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল। আমি তাঁরই অনুসরণ করব। কেননা এ ছাড়া তোমার নাজাত বা মুক্তি নেই।

আল্লাহ আমাকে এবং তোমাকে সৌভাগ্য ও নাজাতের
তাওফীক দিন, আমীন!

তৃতীয় অধ্যায়: সত্যে দীন- ইসলাম- সম্পর্কে জানা

হে বিবেকবান! তুমি যখন জানতে পারলে যে, আল্লাহ তা'আলাই হচ্ছেন তোমার রব, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, রিষিক দিচ্ছেন, আর তিনিই তোমার একমাত্র সত্য ইলাহ, যার কোন শরীক নেই। তোমার জন্য শুধু তাঁরই ইবাদত করা আবশ্যিক। তুমি আরও জানতে পারলে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার ও সকল মানুষের প্রতি প্রেরিত আল্লাহর রাসূল। তুমি এটাও জেনে রেখ যে, তোমার আল্লাহর ব্যাপারে ঈমান ও তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে ঈমান তখনই বিশুদ্ধ হবে, যখন তুমি ইসলামকে জানবে, এ দীনের উপরে ঈমান আনবে এবং সে অনুযায়ী আমল করবে। কেননা ইসলাম হচ্ছে একমাত্র দীন, যার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট হয়েছেন, তাঁর রাসূলদেরকে আদেশ করেছেন এবং এটা সহকারেই তিনি সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমস্ত মানুষের কাছে প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তাদের উপরে এ দীন অনুযায়ী আমল করা আবশ্যিক করেছেন।

ইসলামের পরিচয়:

সর্বশেষ নবী ও সমগ্র মানুষের প্রতি প্রেরিত আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “ইসলাম হচ্ছে: এ কথার সাক্ষ্য দেয়া, আল্লাহ ব্যতীত কোনো প্রকৃত ইলাহ নেই, আর মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। সালাত আদায় করা, যাকাত দেয়া, রমাদ্বানে সিয়াম পালন করা, আর বাইতুল্লাহতে পৌঁছানোর সামর্থ থাকলে হজ্জ পালন করা।” [১৪]

সুতরাং ইসলাম হচ্ছে সেই বিশ্বজনীন দীন, যা গ্রহণের ব্যাপারে আল্লাহ সকল মানুষকে আদেশ করেছেন। যার উপরে সকল রাসূলগণ ঈমান রেখেছেন, আর তারা আল্লাহর জন্য তাদের ইসলামের (আত্মসমর্পণের) কথা ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ তাআলা ঘোষণা দিয়েছেন যে, এটিই একমাত্র সত্য দীন। ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দীনকে তিনি কারো থেকে গ্রহণ করবেন না। আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ...﴾ [آل عمران: 19]

“নিশ্চয় আল্লাহর কাছে একমাত্র মনোনীত দীন হচ্ছে ইসলাম।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত : 19]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেন,

﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ

الْخٰسِرِينَ﴾ [آل عمران: 85]

“আর কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো দীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো তার পক্ষ থেকে কবুল করা হবে না এবং সে হবে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।” [সূরা আলে ইমরান : 85]

আয়াতদ্বয়ের সংক্ষিপ্ত অর্থ:

১- আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিয়েছেন যে, তাঁর কাছে দীন হচ্ছে শুধুমাত্র ইসলাম।

২- দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা জানিয়েছেন যে, দীন হিসেবে ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু কারো কাছ থেকে কখনোই গ্রহণ করা হবে না। আর মৃত্যুর পরে শুধুমাত্র মুসলিমরাই সৌভাগ্যবান। আর যারা ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দীনের (জীবন ব্যবস্থার) উপরে থেকে মারা যাবে, তারা আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত। জাহান্নামে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে।

এ কারণেই সকল নবী আলাইহিস সালাম আল্লাহর জন্য তাদের ইসলামের কথা ঘোষণা করেছেন এবং যারা

ইসলাম গ্রহণ করে নাই, তাদের থেকে দায়মুক্ত হওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। সুতরাং ইহুদী ও খৃস্টানদের মধ্য হতে যারা মুক্তি ও সৌভাগ্য কামনা করে, তারা যেন ইসলামে প্রবেশ করে এবং ইসলামের রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করে; যেন তারা মূসা ও ঈসা আলাইহিমাস সালামের প্রকৃত অনুসারী হতে পারে। কারণ মূসা, ঈসা ও মুহাম্মাদ আলাইহিমাস সালামসহ সকল নবীই মুসলিম ছিলেন। তারা সকলেই ইসলামের দিকে আহ্বান করেছেন। যেহেতু ইসলামই ঐ দীন, যা সহকারে তাদেরকে আল্লাহ প্রেরণ করেছিলেন। আর তাই শেষনবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওতের পর থেকে দুনিয়ার শেষ পর্যন্ত যেই আগমন করবে, তার জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত নিজেকে মুসলিম তথা আল্লাহর অনুগত বলা সঠিক হবে না এবং আল্লাহও তার এ দাবী গ্রহণ করবেন না, যতক্ষণ না সে ব্যক্তি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত রাসূল বলে ঈমান আনবে, তার অনুসরণ করবে এবং আল্লাহ তার উপরে যা নাযিল করেছেন তথা কুরআন অনুযায়ী আমল করবে। আল্লাহ তা'আলা মহাগ্রন্থ কুরআনে বলেছেন:

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [آل عمران: 31]

“বলুন, ‘তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত : 31]

আয়াতটির সংক্ষিপ্ত অর্থ:

যারা আল্লাহর ভালোবাসার দাবী করেন তাদের বিষয়ে আল্লাহ তা‘আলা তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ কথা বলার আদেশ দেন, যদি তোমরা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও, তাহলে তোমরা আমার অনুসরণ করো, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন। কেননা আল্লাহ তা‘আলা ততক্ষণ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন না, তোমাদের গোনাহও ক্ষমা করবেন না, যতক্ষণ না তোমরা তাঁর রাসূলের উপরে ঈমান আন এবং তাঁকে অনুসরণ কর।

আর যে ইসলাম নিয়ে আল্লাহ তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমস্ত মানুষের কাছে পাঠিয়েছিলেন সেটিই পূর্ণাঙ্গ, সার্বজনীন ও মহানুভবতার ইসলাম। আল্লাহ তাকে পূর্ণতা দান করেছেন এবং তাঁর বান্দার জন্য সেটিকে এমন দীন হিসেবে সন্তুষ্ট হয়েছেন। তাদের থেকে এ দীন ছাড়া অন্য কোন দীনকে গ্রহণ করবেন

না। আর এটিই সেই দিন সমস্ত নবীগণ যার সুসংবাদ দিয়েছেন এবং এর উপরে ঈমান এনেছেন। মহিমান্বিত কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿... الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ

لَكُمْ الْإِسْلَامَ....﴾ [المائدة: 3]

“আজকের দিন আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করলাম। আর তোমাদের ওপর আমার নি‘আমতকে সম্পন্ন করলাম। আর ইসলামকে তোমাদের জন্য দীন হিসেবে মনোনিত করলাম।” [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৩]

আয়াতটির সংক্ষিপ্ত অর্থ:

আল্লাহ তা‘আলা শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর নাযিলকৃত এ আয়াতে কারীমায় সংবাদ দিয়েছেন, যখন তিনি মুসলিমদের সাথে বিদায় হজ্জের সময়ে মক্কার আরাফাতে অবস্থান করছিলেন, আর তারা আল্লাহর কাছে দু‘আ ও মুনাজাত করছিলেন। এটি ছিল রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের শেষ দিকের ঘটনা, যখন আল্লাহ তাকে সাহায্য করল, ইসলাম চূর্তদিকে ছড়িয়ে পড়েছিলো এবং কুরআন নাযিলও সম্পন্ন হয়েছিল।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি মুসলিমদের জন্য তাদের দীনকে পরিপূর্ণ করেছেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করা ও তার উপরে কুরআন নাযিল করার মাধ্যমে তাদের উপরে নি'আমাতকে পূর্ণতা দান করেছেন। তিনি আরও সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি ইসলামকে দীন হিসেবে সন্তুষ্ট হয়েছেন, ইসলামের উপরে তিনি কখনোই অসন্তুষ্ট হবেন না। আর কারো কাছ থেকে ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দীনকে তিনি কখনো গ্রহণ করবেন না।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো সংবাদ দিয়েছেন যে, যে ইসলাম সহকারে তিনি তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সকল মানুষের কাছে প্রেরণ করেছেন, সেটাই হচ্ছে পরিপূর্ণ, সার্বজনীন ও সকল স্থান, কাল ও জাতির জন্য উপযুক্ত দীন। সেটা জ্ঞান-বিজ্ঞান, সহজ-সরল, ন্যায় ও কল্যাণের দীন। জীবনের সকল ক্ষেত্রে এটি একটি সুস্পষ্ট, পরিপূর্ণ ও সুপ্রতিষ্ঠিত জীবন বিধান। এটিই ধর্ম ও রাষ্ট্র উভয়ের সমন্বয়ে গঠিত দীন। এতে রয়েছে বিচার-ফয়সালা, রাজনীতি, সামাজিক বিধি-বিধান, অর্থনৈতিক সমাধানসহ মাননের পার্থিব জীবনের প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের সঠিক পথ নির্দেশনা ও জীবন বিধান। আর এ ধর্মেই রয়েছে মানুষের মৃত্যু পরবর্তী পরকালীন জীবনের সৌভাগ্য।

ইসলামের রুকনসমূহ

আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে পূর্ণাঙ্গ ইসলাম সহকারে প্রেরণ করেছেন তা পাঁচটি রুকনের (ভিত্তির) উপরে প্রতিষ্ঠিত। কোন মানুষ প্রকৃত মুসলিম হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে এগুলোকে স্বীকার করবে এবং তা পালন করবে। আর সেগুলো হল:

১- ব্যক্তি এ কথার সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল।

২- সালাত কায়েম করবে।

৩- যাকাত আদায় করবে।

৪- রমাদ্বানে সিয়াম পালন করবে।

৫- আল্লাহর ঘর হারাম শরীফে পৌঁছানোর সামর্থ থাকলে তাকে গমন করে হজ্জ পালন করবে। [১৫]

প্রথম রুকন: শাহাদাতাইন

এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল।

আর এ সাক্ষ্য প্রদানের রয়েছে বিশেষ অর্থ, যা মুসলিমের জন্য জানা ও সে অনুযায়ী কাজ করা আবশ্যিক। আর যে ব্যক্তি শুধু তা মুখে ঘোষণা করবে, তবে এর অর্থ সম্পর্কে জানে না এবং সে অনুযায়ী কাজও করে না; সে ব্যক্তি এর দ্বারা কোন উপকার পাবে না।

‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ (لا إله إلا الله) বা আল্লাহ ছাড়া কোন প্রকৃত ইলাহ নেই, এর অর্থ হচ্ছে: আসমান ও জমিনে প্রকৃত ইবাদত পাওয়ার একমাত্র হকদার হচ্ছেন মহান আল্লাহ। তিনিই সত্য ইলাহ [উপাস্য]। তিনি ছাড়া অন্য সকল ইলাহ বাতিল। ইলাহ শব্দের অর্থ: উপাস্য, যার ইবাদত করা হয়, যিনি ইবাদত প্রাপ্তির হকদার।

আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত করবে, সে ব্যক্তি কাফের এবং আল্লাহর সাথে শিরককারী মুশরিক। যদিও তার উপাস্য নবী অথবা অলী হয়। যদিও তা আল্লাহর নৈকট্য লাভ এবং তাঁর কাছে পৌঁছানোর মাধ্যম হওয়ার যুক্তিতে হয়। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন, সেই মুশরিকরা তাদের নবীগণ অলিগণের ইবাদত এ যুক্তিতেই করত। কিন্তু সেটা ছিল বাতিল যুক্তি। আল্লাহর নৈকট্য লাভ এবং তার নিকট পৌঁছা কারোর ইবাদতের মাধ্যমে হবে না। বরং তা হবে শুধুমাত্র তাঁর নামসমূহ ও গুণাবলী দ্বারা এবং তার নির্দেশিত সংকাজ করা দ্বারা, যেমন: সালাত, সদকা, যিকির, সিয়াম,

জিহাদ, হজ্জ, পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ ইত্যাদি এবং জীবিত ও উপস্থিত ব্যক্তির দু'আ দ্বারা যদি সে তার ভাইয়ে জন্য দু'আ করে।

ইবাদতের অনেকগুলো প্রকার রয়েছে, যেমন:

১- দু'আ করা:

এটি হচ্ছে, এমন প্রয়োজন পূরণের প্রার্থনা করা, যা পূরণ করার ক্ষমতা শুধু আল্লাহ তা'আলার কাছেই রয়েছে, যেমন: বৃষ্টি দেওয়া, রোগীর সুস্থতা দান করা, এমন বিপদাপদ দূর করা যা কোন সৃষ্টি করতে সক্ষম নয়। আরও যেমন, জান্নাত প্রার্থনা করা, জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাওয়া, সন্তান সন্ততি চাওয়া, রিযিক চাওয়া, সৌভাগ্য কামনা করা ইত্যাদি।

এগুলো সবই কেবল আল্লাহর কাছে চাওয়া যায়। যে ব্যক্তি এগুলোকে কোন জীবিত অথবা মৃত ব্যক্তির কাছে চাইবে, সে তার ইবাদত করল। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাকে এসব শুধু তাঁর কাছে চাওয়ার জন্যই আদেশ করেছেন। তিনি সংবাদ দিয়েছেন যে, দু'আ হচ্ছে ইবাদত। সুতরাং যে ব্যক্তি তা অন্যের জন্য সমর্পন করবে, সে জাহান্নামী। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي

سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [غافر: 60]

“আর তোমাদের রব বলেছেন, 'তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। নিশ্চয় যারা অহংকারবশে আমার 'ইবাদাত থেকে বিমুখ থাকে, তারা অচিরেই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে।” [সূরা গাফির (মু'মিন), আয়াত : ৬০].

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিয়েছেন, তিনি ছাড়া অন্য যাদের কাছে দু'আ করা হয়, তারা কারো উপকার বা ক্ষতি কোনটিই করতে পারে না, হোক তারা নবী অথবা অলী। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ

وَلَا تَحْوِيلًا﴾ [الإسراء: 56]

“বলুন, 'তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া যাদেরকে ইলাহ মনে কর তাদেরকে ডাক, অতঃপর দেখবে যে, তোমাদের দুঃখ-দৈন্য দূর করার বা পরিবর্তন করার শক্তি তাদের নেই।” [আল-ইসরা: ৫৬ এবং এর পরবর্তী আয়াত]

, আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেন,

﴿وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ [الجن: 18]

“আর নিশ্চয় মসজিদসমূহ আল্লাহরই জন্য। কাজেই আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কাউকে ডেকো না।” [সূরা আল-জিন, আয়াত: ১৮।]

২- যবাই করা, মানত করা এবং কুরবানী করা:

সুতরাং একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য যবেহ করা, কুরবানী করা অথবা মানতের মাধ্যমে নৈকট্য অর্জন করার চেষ্টা বৈধ হবে না। যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে যবাই করবে -যেমন কবর অথবা জিনের উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি যবাই করবে-, তাহলে সে গাইরুল্লাহ (আল্লাহ ব্যতীত অন্যের) ইবাদত করল। এর মাধ্যমে সে আল্লাহর লা'নত বা অভিশাপের উপযুক্ত হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأنعام:

[162

“বলুন, ‘আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহরই জন্য।” [সূরা আল-আন'আম. আয়াত : ১৬২]

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:
“যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর জন্য যবেহ করে, তার ওপর আল্লাহর
লানত।” [১৬]

যখন কোন মানুষ বলবে: “ওমূকের জন্য আমার ওপর
মানত রয়েছে যদি আমার কাজটি হাসিল হয়, তাহলে আমি
সাদকা করব বা এই কাজ করব।” এটি আল্লাহর সাথে
শিরক; কেননা তা মাখলূকের জন্য করা মানত করেছে।
মানত হল একটি ইবাদত, যা শুধু আল্লাহর জন্যই হয়। আর
বৈধ মানত হল, এভাবে বলা: “যদি আমার এ কাজটি হাসিল
হয়, তাহলে আল্লাহর জন্য, আমি এত এত দান করব অথবা
এই এই নেক কাজ করব।”

৩- বিপদ হতে উদ্ধারের প্রার্থনা (ইস্তিগাহ),
সাহায্য চাওয়া (ইস্তিআনাহ) এবং আশ্রয়
চাওয়া (ইস্তিআযাহ): [১৭]

সুতরাং একমাত্র একক আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে বিপদ
হতে আশ্রয় চাওয়া যাবে না, সাহায্য চাওয়া যাবে না এবং
আশ্রয় প্রার্থনা করা যাবে না। আল্লাহ তাআলা কুরআনে
কারীমে বলেছেন:

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: 5]

“আমরা শুধু আপনারই ইবাদাত করি, এবং শুধু আপনারই সাহায্য প্রার্থনা করি” [সূরা আল-ফাতিহাহ: ৫]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেছেন,

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿١﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿٢﴾﴾ [الفلق: 2-1]

“বলুন, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি ঊষার রবের কাছে। তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে।” [সূরা আল-ফালাক : ১-২]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “নিশ্চয়ই আমার কাছে কোন কিছুর ফরিয়াদ করা যাবে না। কেবল আল্লাহর কাছেই ফরিয়াদ করা যাবে।” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন: “কিছু চাইবে তখন আল্লাহর কাছেই চাইবে, আর কোন সাহায্য চাইলে একমাত্র আল্লাহর কাছেই চাইবে।”

উপস্থিত জীবিত মানুষ যে বিষয়ে সক্ষম শুধু সে বিষয়ে তার কাছে বিপদে সাহায্য ও সহযোগিতা চাওয়া যাবে। তবে বিপদ হতে আশ্রয় প্রার্থনা শুধু আল্লাহর কাছেই করা যাবে। অনুপস্থিত ও মৃত ব্যক্তির কাছে বিপদ উদ্ধারের কথা কখনোই বলা যাবে না; কেননা সে কোন কিছুর মালিক নয়। হোক সে নবী, অলী অথবা কোন ফিরিশতা।

আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউই গায়েব জানে না। যদি কেউ গায়েব জানার দাবি করে, তাহলে সে কাফির এবং তাকে অস্বীকার করা ফরয। যদি সে গণনা করে কোন কিছু বলে, আর তা বাস্তবিকভাবে ঘটেও থাকে, তাহলে তা কাকতালীয় ব্যাপার মাত্র। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “যে ব্যক্তি কোন গনক বা ভবিষ্যতদ্বাণী করা লোকের কাছে আসে, আর সে যা বলে, তা সত্য বলে মনে করে, তাহলে মুহাম্মাদের উপরে যা কিছু নাযিল হয়েছে, সে তার পুরোটাই অস্বীকার করে।”[২০]

তাওয়াক্কুল (ভরসা বা নির্ভর করা), রজা বা আশা [২১] ও খুশু' বা ভয় পাওয়া: সুতরাং মানুষ কেবলমাত্র আল্লাহর উপরেই তাওয়াক্কুল বা ভরসা করবে, আল্লাহর কাছে কোন কিছু পাওয়ার আশা করবে এবং আল্লাহকে ভয় করবে।

আর অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, ইসলামের দাবীদার এমন অনেক ব্যক্তিও আল্লাহর সাথে শিরক করছে, তারা জীবিতদের মধ্য থেকে সম্মানিত কিছু ব্যক্তি [তাদের অনুপস্থিতিতে প্রয়োজন পূরণের জন্য] এবং কবরবাসীদের ডাকে, তাদের কবরের তাওয়াফ করছে, তাদের কাছে তাদের প্রয়োজন মিটানোর প্রার্থনা করছে। এগুলো নিঃসন্দেহে আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত। আর যে এমনটি করবে, সে মুসলিম নয়। যদিও সে ইসলামের দাবীদার হোক

এবং মুখে বলে: ‘আল্লাহ ছাড়া কোন প্রকৃত ইলাহ নেই ও মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল’, যদিও সে সিয়াম পালন করুক, সালাত আদায় করুক, অথবা বাইতুল্লাহ শরীফে হজ্ব আদায় করুক। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ

وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الزمر: 65]

“আর আপনার প্রতি ও আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই অহী করা হয়েছে যে, ‘যদি আপনি শিরক করেন, তবে আপনার সমস্ত আমল নিষ্ফল হবে এবং অবশ্যই আপনি হবেন ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।” [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৬৫]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেছেন,

﴿..... إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا

لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ [المائدة: 72]

“নিশ্চয় কেউ আল্লাহর সাথে শরীক করলে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত অবশ্যই হারাম করে দিবেন এবং তার আবাস হবে জাহান্নাম। আর যালেমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই।” [সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৭২]

আল্লাহ তা'আলা তার রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মানুষের জন্য এ কথা বলার নির্দেশ দিয়েছেন:

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ۗ أَحَدًا﴾
[الكهف: 110]

“বলুন, আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। আমার নিকট অহী প্রেরণ করা হয় যে, তোমাদের ইলাহই এক ইলাহ। সুতরাং যে তার রবের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার রবের ইবাদাতে কাউকে শরীক না করে।” [সূরা আল-কাহাফ, আয়াত: ১১০]

এই সমস্ত লোক মূর্খদেরকে কিছু নিকৃষ্ট ও পথভ্রষ্ট আলিমগণ ধোকা দিয়েছে। যারা দ্বীনের শাখা-প্রশাখাগত মাসআলা জেনে থাকলেও দিনের মূল বিষয় তাওহীদ সম্পর্কে অজ্ঞ। ফলে তারা তাওহীদের প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার কারণে মানুষকে শাফা'আত এবং অসীলার নামে শিরকের দিকে আহ্বান করেছে। আর এক্ষেত্রে তাদের দলিল হচ্ছে, কতিপয় নসের (কুরআন ও হাদীসের মূলপাঠ) বিভ্রান্তিকর ব্যাখ্যা এবং সম্প্রতি ও প্রাচীণকাল থেকে আসা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে বানোয়াট

কতিপয় মিথ্যা হাদীস, বানোয়াট কাহিনী, শয়তান কর্তৃক প্রদর্শিত কিছু স্বপ্ন বা অনুরূপ আরো অন্যান্য কিছু বিভ্রান্তিকর বিষয়, যা তারা তাদের কিতাবের মধ্যে সন্নিবেশিত করেছে; যেন আল্লাহ ব্যতিরেকে অন্যের জন্য তাদের ইবাদতের ব্যাপারে এগুলো থেকে তারা দালিলিক শক্তি অর্জন করতে পারে। আর এগুলো শয়তান এবং প্রবৃত্তির অনুসরণের এবং পূর্বপুরুষদের অন্ধ আনুগত্যের কারণে হয়ে থাকে। যেমনটি ছিল প্রথম যুগের মুশরিকদের অবস্থা।

আর যে অসীলার কথা আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে অন্তর্দৃষ্টি করার আদেশ করেছেন, তাঁর অর্থ: “তোমরা অসীলা অন্তর্দৃষ্টি করো”, সেটা হচ্ছে তাওহীদের ভিত্তিতে নেক আমল করা, সালাত আদায় করা, সদকা করা, সিয়াম পালন করা, হজ্জ আদায় করা, জিহাদ করা, সৎ কাজের আদেশ দেওয়া, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা, রক্তের সম্পর্ককে অটুট রাখা ইত্যাদি। পক্ষান্তরে মৃত ব্যক্তিদেরকে আহ্বান করা মুসীবত ও বিপদাপদে তাদের কাছে সাহায্য চাওয়া, এগুলো হচ্ছে আল্লাহকে ছেড়ে তাদের ইবাদত করা।

অলী, নবীগণ ও তারা ছাড়া মুসলিমদের থেকে যাদের শাফা'আত করার অনুমতি আল্লাহ দেবেন, তার প্রতি ঈমান আনা জরুরি। কিন্তু শাফা'আত কখনো মৃত ব্যক্তিদের কাছে চাওয়া যাবে না। কেননা সেটি আল্লাহর হক, এটা তাঁর

অনুমতি ব্যতীত অন্য কারোর কাছ থেকে অর্জন করা যাবে না। সুতরাং আল্লাহর তাওহীদে বিশ্বাসী ব্যক্তি তা আল্লাহর কাছেই এ বলে চাইবে: “হে আল্লাহ! তোমার রাসূলকে এবং নেক বান্দাদেরকে আমার জন্য শাফা‘আতকারী বানাও।” সে কখনো এমন বলবে না: “হে অমুক! আমার জন্য শাফা‘আত করুন!”; কেননা সে হচ্ছে মৃত। আর মৃত ব্যক্তির কাছে কখনোই কিছু চাওয়া যায় না। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾

[الزمر: 44]

“বলুন, সকল শাফা‘আত (সুপারিশ) আল্লাহরই মালিকানাধীন, আসমানসমূহ ও যমীনের মালিকানা তাঁরই, তারপর তাঁরই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত করা হবে।” [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৪৪]

বুখারী, মুসলিম, সুনানের অন্যান্য কিতাবে বর্ণিত সহীহ হাদীসসমূহের মধ্যে ইসলামের পরিপন্থী যেসব হারাম বিদ‘আতকে রাসূলুল্লাহ নিষেধ করেছেন, তা হলো কবরের উপরে মসজিদ বানানো, বাতি জ্বালানো, কবরের উপরে ঘর বানানো, কবর পাকা করা, এর উপরে লেখা, গেলাফ পরানো, কবরস্থানে সালাত আদায় করা ইত্যাদি। রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগুলোর প্রত্যেকটি বিষয় হতে নিষেধ করেছেন। কেননা এগুলো হচ্ছে কবরবাসীদের ইবাদত করার অন্যতম মারাত্মক উপকরণ।

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, আল্লাহর সাথে শিরকের মধ্যে রয়েছে: অনেক দেশে অনেক মূর্খরা বিভিন্ন কবরের গিয়ে যা করছে, যেমন: মিশরে বাদাওয়ী ও সাইয়েদা যাইনাবের কবরে, ইরাকে জীলানীর কবরে, ইরাকের নাজাফে ও কারবালাতে অবস্থিত আহলুল বাইত -রদিয়াল্লাহু আনহুম- এর দিকে সম্পৃক্ত কবরসমূহ ও বিভিন্ন রাষ্ট্রে থাকা আরো অন্যান্য কবরসমূহের তাওয়াফ করা, উক্ত কবরবাসীদের থেকে প্রয়োজন পূরণের জন্য চাওয়া এবং তারা ভালো-মন্দের অধিকারী বলে বিশ্বাস করা।

এ কথা স্পষ্ট যে, এ সমস্ত লোকেরা তাদের এ কাজের কারণে পথভ্রষ্ট মুশরিক। যদিও তারা ইসলামের দাবীদার, সালাত আদায় করে, সিয়াম পালন করে, বাইতুল্লাহ শরীফে হজ্জ করে, আর মুখে 'আল্লাহ ছাড়া কোনে প্রকৃত ইলাহ নেই আর মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল উচ্চারণ করে।' কেননা 'আল্লাহ ছাড়া কোনে প্রকৃত ইলাহ নেই আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল'। এ কালিমা মুখে উচ্চারণ করার মাধ্যমে কেউ তাওহীদপন্থী হবে না; যতক্ষণ না সে এর অর্থ জেনে তার উপরে আমল করবে, যেমনটি ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে

অমুসলিম ব্যক্তি এ কথা বলার মাধ্যমে প্রথমে ইসলামে প্রবেশ করল এবং তাকে মুসলিম নাম করণ করা হল যতক্ষণ না তার থেকে এর বিপরীতে এ সকল মূর্খদের মত শিরকের উপরে অটল থাকা অথবা তাকে জানানোর পরেও ইসলামের ফরজ কোন বিষয়কে অস্বীকার করা অথবা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক এমন কোন দীনের উপরে ঈমান আনায়ন করার প্রমাণ পাওয়া যায়।

নবী ও অলীগণ [২২] -এর মধ্য থেকে যাদেরকে আহ্বান করা হয় এবং বিপদাপদ থেকে যাদের কাছে রক্ষা চাওয়া হয় তারা সম্পূর্ণভাবে দায়মুক্ত। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলদেরকে পাঠিয়েছেন মানুষকে এককভাবে তাঁরই ইবাদাত করার প্রতি দাওয়াত দেয়ার জন্য এবং তিনি ছাড়া অন্য কোন কারো ইবাদত না করার দাওয়াত দেয়ার জন্য। চাই সে নবী, অলী বা অন্য যেই হোক।

আল্লাহর রাসূলের ও তার অনুসারী অলীগণের ভালোবাসা তাদের ইবাদতে নয়। কেননা তাদের ইবাদত করা তাদের সাথে শত্রুতা করা। বরং তাদের ভালোবাসা হচ্ছে তাদের অনুসরণ করা ও তাদের অনুসৃত পথে চলা। প্রকৃত মুসলিম নবী ও অলীগণকে ভালোবাসে; কিন্তু তাদের ইবাদাত করে না।

আর আমরা বিশ্বাস করি যে, আমাদের নিজের জীবন, পরিবার, সন্তান এমনকি সকল মানুষের প্রতি থাকা ভালোবাসা থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভালোবাসাকে উপরে রাখা আমাদের ওপর ফরয।

মুক্তিপ্ৰাপ্ত দল

মুসলিমরা সংখ্যায় অনেক বেশী হলেও প্রকৃতপক্ষে তারা খুবই কম। আর ইসলামের দাবীদার দলসমূহও অনেক, যাদের সংখ্যা ৭৩ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। যাদের ব্যক্তিবর্গের সংখ্যা একশ কোটির থেকেও বেশী। [২৩] কিন্তু প্রকৃত মুসলিম দল মূলত একটিই। তারা হল যারা আকীদা ও আমলের ক্ষেত্রে আল্লাহকে এক জানে এবং রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের পথের উপরে চলে। যেমনটি এ ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “ইহুদীরা একাত্তরটি ফিরকাতে বিভক্ত হয়েছিল, খৃস্টানরা বাহাত্তরটি ফিরকাতে বিভক্ত। আর আমার উম্মাত অচিরেই তিহাত্তরটি ফিরকাতে বিভক্ত হবে। তাদের প্রত্যেকটি জাহান্নামী শুধু একটি ফিরকা (দল) ব্যতীত।” সাহাবীগণ বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! তারা কারা? তিনি বললেন: “আমি এবং আমার

সাহাবীরা আজকে যে পথে রয়েছি, এরকম পথের উপরে যারা থাকবে।” [২৪]

যে বিষয়ের উপরে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ ছিলেন, তা হচ্ছে: ‘আল্লাহ ছাড়া কোন প্রকৃত ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল’ এ কথার অর্থের ওপর বিশ্বাস করা এবং কেবল আল্লাহকে ডাকার মাধ্যমে, আল্লাহর জন্য জবেহ ও মান্ত করার মাধ্যমে সে অনুযায়ী আমল করা। আর উপকার ও ক্ষতির মালিক তিনিই একক বলে বিশ্বাস করা। এছাড়াও ইসলামের রুকনসমূহ একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার জন্য আদায় করা, তাঁর ফিরিশতাগণ, কিতাবসমূহ, রাসূলগণ, পুনরুত্থান, হিসাব-নিকাশ, জান্নাত, জাহান্নাম ও তাকদীরের ভালোমন্দ সবই আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে ফয়সালাকৃত প্রতি বিশ্বাস রাখা। সকল ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহকে শাসনের মাপকাঠি হিসেবে নির্ধারণ করা, কুরআন-সুন্নাহর ফয়সালাতে সন্তুষ্ট থাকা, আল্লাহর অলীদের সাথে বন্ধুত্ব রাখা, তাঁর শত্রুদের সাথে শত্রুতা রাখা। আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়া, আল্লাহর পথে জিহাদ করা, জিহাদের জন্য একত্রিত হওয়া, মুসলিম শাসকের শরী‘আতসম্মত কথা শোনা ও মেনে চলা, যেখানেই থাকুক সত্য কথা বলা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী ও পরিবারবর্গকে

মুহাব্বাত করা ও তাদের প্রতি সৌহাদ্যপূর্ণ সম্পর্ক রাখা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদেরকে ভালোবাসা, তাদেরকে তাদের মর্যাদা অনুযায়ী একের উপরে অন্যকে অগ্রগামী মনে করা, তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা, তাদের মধ্যকার বিবাদের [২৫] ব্যাপারে আলোচনা থেকে বিরত থাকা, তাদের ব্যাপারে কতিপয় মুনাফিকদের ষড়যন্ত্রমূলক সমালোচনাতে বিশ্বাস না করা। উক্ত সমালোচনাগুলো দ্বারা তারা মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ তৈরী করতে চেয়েছে, কতিপয় মুসলিম আলিম ও ঐতিহাসিকদেরকে সেগুলো দ্বারা ধোকা দিয়েছে। ফলত তারাও সৎ নিয়তে তাদের গ্রন্থসমূহে এগুলোকে স্থান দিয়েছে, যা স্পষ্ট ভুল ছিলো।

আর যারা দাবী করে যে, তারা আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত, এবং তারা নিজেদেরকে 'সাইয়িদ' বলে নাম রাখে, তাদের জন্য আবশ্যিক যে, তারা তাদের এ বংশসূত্র সম্পর্কে ভালোভাবে নিশ্চিত হয়; কেননা আল্লাহ তা'আলা লানত দিয়েছেন এমন ব্যক্তির ওপর যে তার নিজের পিতার বাইরের বংশকে সম্পৃক্ত করে। আর যদি তাদের বংশ পরম্পরা সাব্যস্ত হয়, তবুও তাদের উপরে আবশ্যিক যে, তারা একনিষ্ঠ তাওহীদের ক্ষেত্রে, গুনাহের কাজ পরিত্যাগ করা বিষয়ে, মানুষ তার দিকে ঝুঁকে পড়ুক এবং তার পা ও হাঁটুতে চুষন করুক, এসব ব্যাপারে সন্তুষ্ট না হওয়া ব্যাপারে

রাসূলের পরিপূর্ণ অনুকরণ করবে। আর সে তার অন্যান্য মুসলিম ভাইদের থেকে কোন বিশেষ পোষাকের মাধ্যমে নিজেকে আলাদা করবে না। কেননা এগুলো সবই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে পথের উপরে ছিলেন, তার স্পষ্ট বিরোধী। আর তিনি তার থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। আর আল্লাহর কাছে সম্মানিত ব্যক্তি তো সেই যে সবচেয়ে আল্লাহভীরু।

আমাদের নবী মুহাম্মাদের ওপর, তার পরিবার ও তার সাথীদের ওপর আল্লাহ সালাত ও অসংখ্য সালাম নাযিল করুন।

হুকুম প্রদান ও আইন প্রণয়ন শুধুমাত্র আল্লাহর অধিকার। যেখানেই উক্ত আইন বাস্তবায়িত হবে, সেখানেই ন্যায়, রহমত ও মর্যাদা থাকবে।

‘আল্লাহ ছাড়া কোন প্রকৃত ইলাহ নেই’ যার উপরে বিশ্বাস রাখা ও সে অনুযায়ী আমল করা আবশ্যিক, তার আরেকটি অর্থ হচ্ছে: হুকুম প্রদান ও আইন প্রণয়ন এককভাবে আল্লাহরই অধিকার। সুতরাং কোন মানুষের জন্য জায়েয নেই যে, সে যে কোন বিষয়ে আল্লাহর আইনের পরিপন্থী কোন আইন প্রণয়ন করবে। কোন মুসলিমের জন্য আল্লাহ যা বিধান হিসেবে নাযিল করেছেন, এর বিপরীত ফয়সালা

করাও বৈধ নয়।এছাড়াও আল্লাহর শরী'আতের বিরোধী এমন কোন ফয়সালাতে সন্তুষ্ট হওয়া, আল্লাহ যা হারাম করেছেন, তা হলাল করা, আবার আল্লাহ যা হলাল করেছেন, তা হারাম করাও বৈধ নয়। যে ব্যক্তি বিরোধিতার ইচ্ছায় অথবা সন্তুষ্টচিত্তে তা করবে, সে আল্লাহকে অস্বীকারকারী (কাফির)। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿..... وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾

[المائدة: 44]

“আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তার মাধ্যমে ফয়সালা করে না, জেনে রেখ, তারাই হচ্ছে কাফির (অস্বীকারকারী)।” [সূরা আল-মায়িদাহ: ৪৪]

রাসূলগণের দায়িত্ব যা দিয়ে আল্লাহ তাদের প্রেরণ করেছেন।

মানুষকে তাওহীদের কালিমা -আল্লাহ ছাড়া কোন প্রকৃত ইলাহ নেই- এর প্রতি আহ্বান জানানো এবং এর দাবী অনুযায়ী আমল করা। আর তা হচ্ছে এককভাবে আল্লাহর ইবাদাত করা এবং মাখলূকের ইবাদত ও তাদের শরী'আত (আইন) থেকে বের হয়ে খালেকের ইবাদত ও তার

শরীআতের আনুগত্য করার প্রতি এগিয়ে আসা যিনি একক তার কোন শরীক নেই।

যে ব্যক্তি গবেষণা সহকারে কুরআন পাঠ করবে আর অন্ধ তাকলীদ (দলীলবিহীন অনুসরণ) থেকে দূরে থাকবে, সে পুরোপুরি বুঝতে পারবে যে, আমরা যা ইতোপূর্বে বর্ণনা করেছি সেটিই সঠিক। সে আরো বুঝতে পারবে যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষের সাথে ও অন্যান্য মাখলূকের সাথে তাঁর নিজস্ব যে সম্পর্ক নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তার প্রতি ঈমান আনয়নকারী গোলামীর সম্পর্ক। সুতরাং মুমিন ব্যক্তি তার সকল প্রকার ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্যই করবে, ইবাদত সে অন্য কারো উদ্দেশ্যে করবে না। আর নবীগণ ও নেককার বান্দাদের ব্যাপারে তিনি মুমিনের সম্পর্ক নির্ধারণ করেছেন এভাবে যে, সে তাদেরকে ভালোবাসবে, তবে তা হবে আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলার ভালোবাসার অনুগামী এবং তাদের অনুসরণ করবে। আবার কাফিরদের সাথে তার সম্পর্ককে নির্ধারণ করেছেন এভাবে যে, সে তাদেরকে ঘৃণা করবে; যেহেতু আল্লাহ তাদেরকে ঘৃণা করেন। সাথে সাথে তাদেরকে ইসলামের পথে আহ্বান করতে থাকবে এবং তাদেরকে ইসলাম সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেবে; যাতে তারা হিদায়াত পেতে পারে। আর যখন তারা ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করবে, আল্লাহর হুকুম মানতে অস্বীকার করবে, তখন মুসলিমরা তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে; যতক্ষণ না

ফিতনা দূরীভূত হয়ে দীন সর্বত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট হয়ে যায়। তাওহীদের কালিমা -আল্লাহ ছাড়া কোন প্রকৃত ইলাহ নেই- এর এসব অর্থসমূহ জানা ও সে অনুযায়ী আমল করা মুসলিমের জন্য ফরয; যাতে সে প্রকৃত মুসলিম হতে পারে।

‘মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল’ এ সাক্ষ্য প্রদানের অর্থ

আর ‘মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল’ একথার সাক্ষ্য দেওয়ার অর্থ হচ্ছে যে, তুমি জানবে এবং বিশ্বাস করবে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পক্ষ হতে সকল মানুষের জন্য একজন রাসূল। তিনি একজন বান্দা, যার ইবাদত করা যায় না। তিনি একজন রাসূল, যাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা যায় না। বরং তাঁর অনুসরণ ও আনুগত্য করতে হবে। যে ব্যক্তি তার অনুসরণ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে তার অবাধ্যতা করবে, সে জাহান্নামে যাবে। আর তুমি একথাও জানবে এবং বিশ্বাস করবে যে, সকল বিধি-বিধান গ্রহণ করার ক্ষেত্রে হোক তা আল্লাহর আদেশকৃত ইবাদাতের পদ্ধতি সংক্রান্ত অথবা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিচার ফয়সালা বা আইন সংক্রান্ত, অথবা হালাল এবং হারাম হওয়ার বিষয়ে, সম্মানিত রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পদ্ধতি ছাড়া গ্রহণ করা যাবে না। কেননা তিনি হচ্ছেন শরী‘আতকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রেরিত আল্লাহর রাসূল। সুতরাং কোনো মুসলিমের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের পন্থার

বিপরীত কারো কাছ থেকে আগত আইন বা শরী'আত গ্রহণ করা জায়িয হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿... وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ

اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾ [الحشر: 7]

“আর যা রাসূল তোমাদের কাছে নিয়ে এসেছেন, তোমরা তা গ্রহণ করো। আর যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন, তা হতে বিরত থাকো। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তিদানে অত্যন্ত কঠোর।” [সূরা আল-হাশর, আয়াত : ৭]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেন:

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي

أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾ [النساء: 65]

“কিন্তু না, আপনার রবের শপথ! তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচার ভার আপনার উপর অর্পণ না করে; অতঃপর আপনার মীমাংসা সম্পর্কে তাদের মনে কোনো দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে নেয়।” [সূরা আন-নিসা : ৬৫]

আয়াত দুটির অর্থ:

১- আল্লাহ তা'আলা প্রথম আয়াতে মুসলিমদেরকে আদেশ করছেন, আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব বিষয়ে তাদেরকে আদেশ করেন এবং যা থেকে তিনি নিষেধ করেন, তারা যেন সেক্ষেত্রে তার পূর্ণ অনুসরণ করে। কেননা নিশ্চয়ই তিনি আল্লাহর আদেশেই আদেশ করেন এবং আল্লাহর নিষেধেই তিনি নিষেধ করে থাকেন।

২- দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নিজেই তাঁর পবিত্র সত্তার কসম করেছেন যে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি কোন ব্যক্তির ঈমান বিশুদ্ধ হবেনা; যতক্ষণ না সে আল্লাহর রাসূলকে তার মধ্যে ও অন্যান্যদের মধ্যে বিদ্যমান বিবাদের বিষয়ে [২৬] ফয়সালাকারী হিসেবে না মানবে এবং তাঁর হুকুমের প্রতি সন্তুষ্ট না হবে। আর তার পক্ষে অথবা বিপক্ষে যাই হোক তা মেনে নেবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “যে কেউ এমন কোনো কাজ করবে, যা আমাদের শরী'আতে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত হবে।” [২৭]

উদাত্ত আহ্বান

হে বিবেকবান! ‘আল্লাহ ছাড়া কোন প্রকৃত ইলাহ নেই, আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল’ এ কথার অর্থ তুমি যখন জানতে পারলে, আর তুমি এটাও জানলে যে, এই সাক্ষ্যদানই হচ্ছে ইসলামের চাবিকাঠি এবং মূলভিত্তি, যার উপরে ইসলাম সুপ্রতিষ্ঠিত। সুতরাং এখন তুমি তোমার একনিষ্ঠ অন্তর থেকে বল: “আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন প্রকৃত ইলাহ নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল।” তুমি এই সাক্ষ্যের দাবী অনুযায়ী আমল করতে থাকো; যেন তুমি দুনিয়া এবং আখিরাতে সৌভাগ্য অর্জন করতে পারো, আর মৃত্যুর পরে আল্লাহর আযাব থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারো।

তুমি আরো জেনে রাখ যে, ‘আল্লাহ্ ছাড়া কোন প্রকৃত ইলাহ্ নেই, আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল’ একথার সাক্ষ্য দেওয়ার দাবি হল: ইসলামের অন্যান্য রুকনগুলোর আমল করা; কেননা আল্লাহ তা‘আলা মুসলিম ব্যক্তির উপরে এই রুকনগুলোকে ফরয করেছেন; যেন মুমিন ব্যক্তি একনিষ্ঠ মনে এবং সত্যভাবে সেগুলোকে আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদাত করে। যে ব্যক্তি

শরী'আতসম্মত ওযর ছাড়া কোন একটি রুকনকে পরিত্যাগ করবে, সে ব্যক্তি 'আল্লাহ ছাড়া কোন প্রকৃত ইলাহ নেই' এ কথার অর্থকে ত্রুটিযুক্ত করে ফেলল। আর তার সাক্ষ্য প্রদান বিশুদ্ধ হবে না।

ইসলামের দ্বিতীয় রুকন: সালাত

হে বিবেকবান! তুমি জেনে রেখো যে, ইসলামের দ্বিতীয় রুকন হচ্ছে সালাত। আর তা হচ্ছে, দিনে ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা। আল্লাহ তা'আলা এ সালাত বিধিবদ্ধ করেছেন; যেন এটি আল্লাহ এবং মুসলিম ব্যক্তির মধ্যে একটি সম্পর্ক গড়ে ওঠে, এতে মুমিন ব্যক্তি তাঁর সাথে গোপনে কথা বলে এবং তাঁর কাছে দু'আ করে। আরও একটি কারণ হচ্ছে, সালাত মুসলিম ব্যক্তিকে অন্যায় এবং অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখে, আর এর মাধ্যমে আন্তরিক ও শারীরিকভাবে প্রশান্তি লাভ হবে, যা তাকে দুনিয়া এবং আখেরাতে সৌভাগ্যবান করবে।

আল্লাহ তা'আলা সালাতের জন্য শরীরের পবিত্রতা, কাপড়ের পবিত্রতা এবং সালাতের জায়গার পবিত্রতাকে বিধিবদ্ধ করেছেন। সুতরাং মুসলিম ব্যক্তি অপবিত্রতা থেকে পবিত্র পানির মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করবে, যেমন: প্রস্রাব-পায়খানা থেকে পবিত্রতা অর্জন করবে, যাতে করে

সে তার শরীরকে বাহ্যিক অপবিত্রতা থেকে পবিত্র রাখতে পারে এবং তার অন্তরকে আভ্যন্তরীণভাবে পবিত্র করতে পারে।

সালাত হচ্ছে দীনের স্তম্ভ। শাহাদাতাইন তথা তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য প্রদানের পরে এটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রুকন। প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয হলো, বালিগ হওয়ার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সে এগুলোর ব্যাপারে যত্নবান হবে। এছাড়া আরও আবশ্যিক হলো, সে তার পরিবারকে এবং সাত বছর বয়স থেকে সন্তানদেরকে তা আদায়ের আদেশ করবে; যেন তারা এতে অভ্যস্ত হতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿... إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾ [النساء: 103]

“নিশ্চয় সালাত মুমিনদের ওপর নির্দিষ্ট ওয়াক্তের মধ্যে আদায় করা ফরয।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১০৩]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেন,

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ

وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾ [البينة: 5]

“আর তাদেরকে কেবল এ নির্দেশই প্রদান করা হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহর ইবাদত করে তাঁরই জন্য দ্বীনকে একনিষ্ঠ করে এবং সালাত কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে। আর এটাই সঠিক দ্বীন।” [সূরা আল-বায়্যিনাহ, আয়াত: ৫]

আয়াতদ্বয়ের সংক্ষিপ্ত অর্থ:

১- প্রথম আয়াতে আল্লাহ জানিয়েছেন যে, মুমিনদের উপরে সালাত একটি অত্যাবশ্যকীয় ফরয ইবাদাত এবং তাদের উচিত সালাত নির্ধারিত ওয়াক্ত অনুযায়ী আদায় করা।

২- মহাপ্রতাপশালী আল্লাহ তা'আলা দ্বিতীয় আয়াতে খবর দিয়েছেন যে, তিনি মানুষকে যে কাজের আদেশ দিয়েছেন এবং যে কারণে তাদের সৃষ্টি করেছেন, তা হচ্ছে: তারা এককভাবে তারই ইবাদত করবে, আর তাদের ইবাদত তার জন্য একনিষ্ঠ করবে, সালাত কায়েম করবে উপযুক্ত লোকদেরকে যাকাত দেবে।

সকল অবস্থাতেই মুসলিমের ওপর সালাত ফরয, এমনকি ভীতি ও অসুস্থতার সময়েও। সুতরাং মুসলিম ব্যক্তি তার সামর্থ অনুযায়ী দাঁড়িয়ে, বসে অথবা শুয়ে সালাত আদায় করবে। এমনকি যদি চোখ বা অন্তর দ্বারা ইশারা ছাড়া সালাত আদায় করতে সক্ষম না হয়, তবে সে ইশারার মাধ্যমেই

সালাত আদায় করবে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন যে, পুরুষ হোক বা নারী হোক, সালাত ত্যাগকারী মুসলিম নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “তাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে চুক্তি হচ্ছে সালাত। যে তা পরিত্যাগ করল, সে কুফুরী করল।” [২৮]

পাঁচ ওয়াক্ত সালাত:

ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব এবং ইশা সালাত।

ফজরের সালাতের ওয়াক্ত শুরু হয় পূর্বদিকে ভোরের আলোর সূত্রপাতের মাধ্যমে, আর তা শেষ হয় সূর্যোদয় হওয়ার মাধ্যমে। ওয়াক্ত শেষ হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব করা বৈধ নয়। যোহরের সালাতের ওয়াক্ত হচ্ছে সূর্য তলে পরা থেকে নিয়ে কোন বস্তুর ছায়া সূর্য তলে পড়ার সময়ের ছায়া বাদ দিয়ে তার সমপরিমাণ হওয়া পর্যন্ত। আসরের সালাতের ওয়াক্ত হচ্ছে: যোহরের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পর থেকে নিয়ে সূর্য হলুদ বর্ণ ধারণ করার আগ পর্যন্ত। ওয়াক্ত শেষ হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব করা বৈধ নয়; বরং সূর্য পরিষ্কার থাকা অবস্থায়ই তা আদায় করতে হবে। সূর্য ডোবার পর থেকে মাগরিবের ওয়াক্ত শুরু হয়, আর তা শেষ হয় লালিমা বিলুপ্তির সাথে সাথে। তবে ওয়াক্ত শেষ হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব করা বৈধ নয়। ইশা সালাতের ওয়াক্ত শুরু হয় মাগরিবের ওয়াক্ত শেষ

হওয়ার পর থেকে, আর তা শেষ হয় শেষরাতে, এরপরে আর দেবী করা যাবে না।

কোন রকম শারঐী ওযর ব্যতীত ইচ্ছাকৃতভাবে যদি কোন মুসলিম ব্যক্তি কোন ওয়াক্তের সালাত আদায়ে বিলম্ব করে সময় পার করে ফেলে তাহলে সে কবিরা গুনাহ করল। তার জন্য আল্লাহর কাছে তাওবা করা আবশ্যিক। তবে সে এমন কাজ পুণরায় করবে না। আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

“সুতরাং দুর্ভোগ সে সালাত আদায়কারীদের জন্য। যারা তাদের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন।” [সূরা আল-মাউন, আয়াত: ৪-৫]

সালাতের বিধানসমূহ

প্রথমত: পবিত্রতা অর্জন:

সালাতে প্রবেশের আগে মুসলিমের জন্য আবশ্যিক হচ্ছে ত্বাহরাত বা পবিত্রতা অর্জন। সুতরাং যদি প্রসাব বা পায়খানা জাতীয় কোন বস্তু বের হয়, তাহলে প্রথমে সে প্রসাব-পায়খানার রাস্তা পরিষ্কার করবে, তারপরে অযু করবে।

অযু: নিয়ত মুখে উচ্চারণ না করে অন্তরে পবিত্রতার নিয়ত করবে; কেননা আল্লাহ এ ব্যাপারে অত্যন্ত ভালো জানেন, আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা মুখে বলেননি। এরপরে 'বিসমিল্লাহ' বলবে। তারপরে কুলি করবে এবং তার নাকে পানি দিয়ে নাক ঝেড়ে ফেলবে। এরপরে তার সম্পূর্ণ মুখমণ্ডল ধৌত করবে। এরপরে দুই হাতের কনুই ও বাহুসহ ধুয়ে ফেলবে। ডান হাত দিয়ে শুরু করবে। তারপরে দুই হাত দিয়ে সে তার মাথাকে মাসেহ করবে, দুই কান মাসেহ করবে। সবশেষে টাখনুসহ দুই পা ধুইবে আর তা ডান পা দিয়ে শুরু করবে।

আর পবিত্রতা অর্জন করার পরে প্রসাব-পায়খানা বা বায়ু বের হয় অথবা ঘুম বা অচেতন জনিত কারণে তার জ্ঞান লোপ পায়; তাহলে সে সালাত আদায়ের ইচ্ছা করলে পুনরায় পবিত্রতা অর্জন করবে। পুরুষ হোক অথবা নারী, কোন মুসলিমের যদি উত্তেজনার সাথে বীর্য বের হয়, যদিও স্বপ্নের মধ্যে, তাহলে সে জুনুবী (গোসল ফরয হয় এমন নাপাক) হয়ে যায়। তখন সে তার সমস্ত শরীর ধুয়ে গোসল করার জানাবাত (বড় অপবিত্রতা) থেকে পবিত্রতা অর্জন করবে। কোন মহিলা যখন হায়েয অথবা নিফাস থেকে পবিত্রতা লাভ করবে, তখন তার উপরে সম্পূর্ণ শরীর ধুয়ে গোসলের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করা ফরয। যেহেতু হায়েয ও নিফাসগ্রস্ত নারীদের সালাত আদায় করা জায়েয

নেই। আর তাদের পবিত্রতা অর্জন (গোসল) করা পর্যন্ত সালাত আদায় করাও আবশ্যিক নয়। আল্লাহ তাদের উপরে তাঁর বিধানকে সহজ করেছেন। আর তাই তাদের থেকে হায়েয ও নিফাস চলাকালীন সময়ে ছুটে যাওয়া সালাতসমূহ কাযা করা রহিত করে দিয়েছেন। আর এছাড়া অন্য যা কিছু এ সময়ে তারা করতে পারবে না (যেমন সিয়াম), তা পুরুষদের ন্যায় কাযা করা ফরয।

পানি না থাকা অবস্থায় অথবা তা ব্যবহারে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকলে যেমন: অসুস্থ ব্যক্তির ক্ষেত্রে, তাহলে সে মাটি দ্বারা তায়াস্মুম করবে। তায়াস্মুমের পদ্ধতি: অন্তরে পবিত্রতা অর্জনের নিয়ত করবে, তারপরে 'বিসমিল্লাহ' বলবে, তারপরে দুইহাত একবার মাটির উপরে মারবে, আর তা দ্বারা স্বীয় মুখমণ্ডল মাসেহ করবে। এরপরে সে বাম হাতের পেট দিয়ে ডান হাতের পিঠে মাসেহ করবে, আবার ডান হাতের পেট দিয়ে বাম হাতের পিঠে মাসেহ করবে। আর এভাবে সে পবিত্রতা লাভ করবে। আর তায়াস্মুমের বিষয়টি প্রতিটি হায়িয বা নিফাসগ্রস্তা নারী পবিত্র হলে, জুনুবী ব্যক্তি, অযু করতে ইচ্ছুক ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য হবে, যখন পানি পাওয়া যাবে না অথবা তা ব্যবহারে কোন ভয়ের কারণ থাকবে।

দ্বিতীয়ত: সালাতের পদ্ধতি:

১- ফজরের সালাত:

পুরুষ অথবা নারী যেই হোক না কেন মুসলিম মাত্রই কিবলামুখী হয়ে দুই রাকাত সালাত আদায় করবে। কিবলা হচ্ছে: মক্কার মাসজিদে হারামে অবস্থিত কা'বা। এরপরে সে মনে মনে ফজরের সালাত আদায়ের নিয়ত করবে, তবে তা মুখে উচ্চারণ করবে না। এরপরে 'আল্লাহু আকবার' বলে তাকবীর দেবে। তারপরে সালাত শুরু দু'আ পড়বে। এসব দু'আর মধ্যে অন্যতম একটি দু'আ হচ্ছে: سبحانك اللهم يارب ارضي و بجمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك

আল্লাহ! আমি আপনার প্রশংসাসহ সুমহান পবিত্রতা ঘোষণা করছি, আপনার নাম বরকতময়, আপনার মর্যাদাও সুউচ্চ। আপনি ছাড়া কোন প্রকৃত ইলাহ নেই।" এরপরে পড়বে: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ ① الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ② الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ③
مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ④ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ⑤ أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ⑥
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ⑦ ﴿

[الفاتحة: 1-7]

“আমি আল্লাহর কাছে বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।” তারপরে সে কুরআনের সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। আর তা হচ্ছে: “রহমান ও রহীম আল্লাহর নামে। আর সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহরই প্রাপ্য। পরম করুণাময়, অতি দয়ালু। বিচার দিনের মালিক। আমরা শুধু আপনারই ইবাদাত করি, এবং শুধু আপনারই সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদেরকে সরল পথের হিদায়াত দিন। তাদের পথ, যাদেরকে আপনি নি‘আমাত দিয়েছেন, যাদের উপর আপনার ক্রোধ আপতিত হয়নি এবং যারা পথভ্রষ্টও নয়।” [সূরা আল-ফাতিহা: ১-৭]

সম্মত থাকলে কুরআন অবশ্যই আরবী ভাষাতেই পড়তে হবে।[২৯] তারপরে সে বলবে: ‘আল্লাহ্ আকবার’ (তথা: আল্লাহই সবচেয়ে বড়)। এরপরে সে তার মাথা ও পিঠকে ঝুঁকিয়ে রুকু করবে। এরপরে তার দুই হাতের তালু দুই হাঁটুর উপরে রাখবে, আর বলবে: (سبحان ربي العظيم) ‘সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম’ (তথা: আমার মহান রবের পবিত্রতা ঘোষণা করছি) তারপরে সে (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمَدَهُ) ‘সামিআল্লাহ হুলামান হামিদাহ’ (তথা: যে আল্লাহর প্রশংসা করেছে, তিনি তা শুনেছেন) বলে রুকু থেকে উঠবে, আর যখন সে দাঁড়িয়ে যাবে, তখন বলবে: (ربنا ولك الحمد) ‘রব্বানা

ওয়া লাকাল হামদ' (তথা: হে আমার রব! যাবতীয় প্রশংসা আপনারই)। তারপর সে 'আল্লাহু আকবার' বলবে এবং তার পায়ের আংগুলসমূহ তার দুই হাঁটু, দুই হাত, কপাল ও নাকের উপরে ভর করে জমিনের উপরে সিজদায় নিপতিত হবে। তারপরে সে তার সিজদাতে বলবে: (سبحان ربي الأعلى) 'সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা' (তথা: আমার সুউচ্চ রবের পবিত্রতা ঘোষণা করছি)। তারপরে সে 'আল্লাহু আকবার' বলে বসবে। বসে বলবে: (بَّ اغفر لي) 'রব্বিগ ফিরলী' (তথা: হে আমার রব! আমাকে ক্ষমা করুন)। তারপরে বলবে: 'আল্লাহু আকবার' এবং মাটিতে দ্বিতীয়বার সিজদা করবে আর বলবে: (سبحان ربي الأعلى) 'সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা'। তারপরে 'আল্লাহু আকবার' বলে সে দাঁড়াবে। তারপরে সূরা ফাতিহা পড়বে আর সেটি হচ্ছে: "আল-হামদুলিল্লাহি রব্বিল 'আলামীন" থেকে শেষ সূরাটির শেষ পর্যন্ত, যেমনটি প্রথম রাকাতের বর্ণনায় গত হয়েছে। তারপরে সে তাকবীর বলবে এবং রুকু করবে তারপরে রুকু থেকে উঠবে এবং সিজদা করবে। তারপরে বসবে, এরপরে দ্বিতীয়বার সিজদা করবে এবং প্রতিটি স্থানে প্রথমবারে যা যা বলেছিল সেগুলোই বলবে।

তারপরে বসে বলবে: "التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام، عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ على

محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد

“মৌখিক, শারিরীক ও আর্থিক সমস্ত ইবাদত আল্লাহর জন্যই নিবেদিত। হে নবী! আপনার উপরে সালাম, আল্লাহর রহমত ও বরকত নাযিল হোক। আমাদের উপরে এবং আল্লাহর নেককার বান্দাদের উপরে সালাম বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন প্রকৃত ইলাহ নেই। এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। হে আল্লাহ! মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে এবং মুহাম্মদের পরিবারের উপরে সালাত (রহমত) বর্ষণ করুন, যেভাবে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও ইবরাহীমের পরিবারের উপরে আপনি সালাত (রহমত) বর্ষণ করেছিলেন। নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত মর্যাদাবান। হে আল্লাহ! মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে এবং মুহাম্মদের পরিবারের উপরে বরকত নাযিল করুন, যেভাবে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও ইবরাহীমের পরিবারের উপরে আপনি বরকত নাযিল করেছিলেন। নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত মর্যাদাবান।” তারপরে সে ডানদিকে ফিরে বলবে: “আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ” (তোমাদের উপরে সালাম আল্লাহর রহমত নাযিল হোক)। তারপরে বামদিকে ফিরে

বলবে: “আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ”। এভাবে ফজরের সালাত সমাপ্ত হবে।

২- যোহর, আসর ও ইশার সালাত:

এগুলোর প্রতিটি সালাত চার রাকাত। প্রথম দুই রাকাত ফজরের দুই রাকাতের মত করে আদায় করবে; তবে দুই রাকাতের পরে তাশাহুদের জন্য বসবে, তখন সে সালামের আগে বৈঠকে যা বলেছিল, সেগুলোই বলবে (অর্থাৎ তাশাহুদ পড়বে)। তবে সালাম না ফিরিয়েই দাঁড়িয়ে যাবে এবং পূর্বের দুই রাকাতের মত আরো দুই রাকাত আদায় করবে। তারপরে সে তাশাহুদের জন্য দ্বিতীয়বার বসবে, আর প্রথম বৈঠকে যা বলেছিল, সেগুলো বলবে (অর্থাৎ তাশাহুদ পড়বে), এরপরে নবীর উপরে দরুদ পড়বে এবং ডান দিকে ও পরে বাম দিকে সালাম ফিরাবে, যেভাবে ফজরের সালাতে সালাম ফিরিয়েছিল।

৩- মাগরিবের সালাত:

মাগরিবের সালাত তিন রাকাত। পূর্বে বর্ণিত নিয়মে প্রথম দুই রাকাত আদায় করবে। তারপরে (প্রথম) বৈঠকে বসে অন্যান্য সালাতের বৈঠকে যা বলেছে, সেগুলোই বলবে। কিন্তু সালাম ফিরাবে না; বরং দাঁড়িয়ে তৃতীয় রাকাত আদায় করবে। পূর্বে যা যা বলেছে এবং করেছে, সে রকমই বলবে এবং করবে। এরপরে তৃতীয় সিজদার পরে বসবে এবং

প্রতিটি সালাতের বৈঠকে যা যা বলেছে, সেগুলোই বলবে। তারপরে ডানদিকে সালাম ফিরাবে, এরপরে বামদিকে। সালাত আদায়কারী ব্যক্তির রুকু ও সিজদাতে পঠিত দো'আ একাধিকবার বলা উত্তম।

এ পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সালাত মসজিদে জামা'আতের সাথে আদায় করা পুরুষদের জন্য আবশ্যিক। একজন ইমাম তাদের সামনে দাঁড়াবে। সে হবে সবচেয়ে সুন্দর কুরআন তেলাওয়াতকারী, সালাতের [হুকুম-আহকাম] সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞাত এবং দীনের দিক থেকে সবার থেকে উপযুক্ত। রুকুর আগে দাঁড়ানো অবস্থায় ফজরের সালাতে এবং মাগরিব ও ইশার সালাতের প্রথম দুই রাকাতে ইমাম জোরে কিরাআত পাঠ করবে, আর তার পিছনে থাকা ব্যক্তির তা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করবে।

আর নারীরা বাড়ীতে পর্দাবৃত ও সংরক্ষিতভাবে এ সালাতগুলো আদায় করবে। সে তার সমস্ত শরীর ঢেকে রাখবে, এমনকি তার দুই হাত ও দুই পাও ঢেকে রাখবে। কেননা মুখমণ্ডল বাদে তার শরীরের পুরোটাই সতর, পুরুষদের থেকে তা ঢেকে রাখার আদেশ করা হয়েছে। কেননা মুখমণ্ডল খুলে রাখা ফিতনা, যা দ্বারা তাদেরকে চিনে ফেলা যায় আর কষ্ট দেওয়া যায়। যদি কোন মুসলিম নারী মসজিদে সালাত আদায় করতে ইচ্ছা করে, তাহলে কোন বাধা নেই। তবে শর্ত হলো, সে আবৃত হয়ে কোনরূপ

সুগন্ধি ব্যবহার না করে বের হবে, আর পুরুষদের পিছনে সালাত আদায় করবে; যাতে পুরুষরা ফিতনায় না পড়ে এবং তারাও ফিতনায় না ফেলে।

মুসলিম ব্যক্তি আল্লাহর ভয়, বিনয় ও অন্তরের মনোনিবেশ সহকারে সালাত আদায় করবে। তার কিয়াম (দাঁড়ানো অবস্থা), রুকু ও সিজদা প্রশান্তচিত্তে আদায় করবে, তাড়াহুড়া করবে না, আসমানের দিকে তাকাবে না, কুরআন ছাড়া অন্য কিছু বলবে না এবং নির্দিষ্ট স্থানে সালাতের যিকর বা দু'আগুলো পড়বে।[৩০] কেননা আল্লাহ তাঁর যিকিরের নিমিত্তেই সালাত আদায় করতে আদেশ করেছেন।

জুমু'আর দিন মুসলিমরা দুই রাকাত জুমু'আর সালাত আদায় করবে। ইমাম এতে ফজরের ন্যায় জোরে কিরাত পড়বে। সালাতের আগে ইমাম দুটি খুত্ববাহ দিবেন, তাতে তিনি মুসলিমদেরকে দায়িত্ব সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দিবেন ও তাদেরকে দীনের বিষয়সমূহ শিক্ষা দিবেন। পুরুষদের ওপর ইমামের সাথে উপস্থিত হওয়া ফরয। আর এটিই হচ্ছে জুমু'আর দিনের যোহরের সালাত।

ইসলামের তৃতীয় রুকন: যাকাত

নিসাব [৩১] পরিমাণ সম্পত্তির মালিক প্রত্যেক মুসলিমকে আল্লাহ আদেশ করেছেন সে যেন প্রতি বছরে তার সম্পত্তির যাকাত আদায় করে। সুতরাং সে দরিদ্র ও অন্যান্য যাদের যাকাত দেয়া বৈধ সে সব হকদারদের যাকাত দেবে। যেমনটি কুরআনে স্পষ্টভাবে বর্ণিত।

স্বর্ণের নিসাব হচ্ছে বিশ মিছকাল আর রৌপ্যের নিসাব হচ্ছে দুইশত দিরহাম অথবা উক্ত অর্থের সমমানের কাগজের মুদ্রা। ব্যবসায়ী পণ্য হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের মালামাল, যখন তার মূল্য নিসাব পরিমাণ হয়ে থাকে, তখন এক বছর পার হলে তার মালিকের উপরে যাকাত আদায় করা ফরয হবে। শস্য ও ফলের নিসাব হচ্ছে তিনশত সা'। তাছাড়া বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুতকৃত স্থাবর সম্পত্তির মূল্য অনুযায়ী যাকাত আদায় করতে হবে। আর ভাড়া দেওয়ার জন্য হলে, তার ভাড়া থেকে যাকাত দিতে হবে। স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্যবসায়ী মালের যাকাতের পরিমাণ বাৎসরিক 'উশরের চারভাগের একভাগ বা ২.৫%। শস্য ও ফলফলাদির ক্ষেত্রে ১০%, যদি তাতে কোনরূপ কষ্ট ব্যতীত পানি পৌঁছে থাকে, যেমন: নদীর পানি, প্রবাহিত ঝর্ণাধারা অথবা বৃষ্টির পানি। আর যদি তাতে কষ্ট করে পানি দেওয়া হয়, যেমন: পানি তুলে সৈঁচের মাধ্যমে পানি পৌঁছানো হয়, তাহলে তাতে ৫% যাকাত ('উশর বা নিসফ 'উশর) আদায় করতে হবে।

ফল ও শস্যের যাকাত প্রদান করার সময় হচ্ছে: তা কর্তন করা বা ফসল সংগ্রহ করার সময়। যদি সে এক বছরের মধ্যে দুই অথবা তিনবার ফসল কর্তন করে, তাহলে প্রত্যেকবারের জন্য যাকাত আদায় করা ফরয। উট, গরু ও ছাগলের যাকাত ইসলামের হুকুম সম্বলিত ফিকহের কিতাবসমূহে বর্ণিত হয়েছে, সেখানে দেখা যেতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ۝﴾ [البينة: 5]

“আর তাদেরকে কেবল এ নির্দেশই প্রদান করা হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহর ইবাদত করে তাঁরই জন্য দ্বীনকে একনিষ্ঠ করে এবং সালাত কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে। আর এটাই সঠিক দ্বীন।” [সূরা আল-বায়্যিনাহ, আয়াত: ৫]

যাকাত প্রদানে দরিদ্র ব্যক্তিদের অন্তরসমূহকে খুশি করা, তাদের প্রয়োজন পূরণ করা এবং ধনী ও তাদের মধ্যে সম্পর্কের বন্ধন শক্তিশালী করা।

ইসলাম ধর্ম মুসলিমদের মধ্যে আর্থিক সহযোগিতা ও সামাজিক দায়িত্ববোধের ব্যাপারটি শুধুমাত্র যাকাতের মধ্যেই সীমিত রাখেনি; বরং ধনীদের উপরে দুর্ভিক্ষের সময়ে

দরিদ্রদের সাহায্য-সহযোগিতা করাকেও ওয়াজিব করেছে। মুসলিমদের জন্য তিনি প্রতিবেশীকে ক্ষুধার্ত রেখে তৃপ্তিসহকারে আহার করা হারাম করেছে। এছাড়াও মুসলিমদের উপরে যাকাতুল ফিতর ওয়াজিব করেছে, যা সে ঈদের দিনে তার শহরে প্রচলিত খাদ্যদ্রব্য হতে এক সা' পরিমাণে প্রদান করে থাকে। এটি শিশু, সেবক (চাকর) সকলের পক্ষ হতে তার দায়িত্বশীল ব্যক্তি আদায় করে। আবার আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদের উপরে কসমের কাফফারা আদায় করা ওয়াজিব করেছেন, যখন কোন ব্যক্তি এমন কোন জিনিসের কসম করে, যা সে করেনি। আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদের উপরে শরী'আতসম্মত মানত পূরণ করাকেও ওয়াজিব করেছেন। নফল সদকাহ করার ব্যাপারেও আল্লাহ মুসলিমদেরকে তাকিদ দিয়েছেন। আর আল্লাহর রাস্তায় ব্যয়কারীদেরকে সর্বোত্তম পুরস্কারের ওয়াদা করেছেন। আবার তাদের পুরস্কারকে বহুগুণে বাড়িয়ে দিবেন বলেও ওয়াদা করেছেন। [তাই] প্রতিটি ভালো কাজের সাওয়াব দশগুণ থেকে সাতশ গুণ এবং তা থেকেও বহুগুণ পর্যন্ত [বাড়িয়ে দিবেন]।

ইসলামের চতুর্থ রুকন: সিয়াম

রমাদান মাসে সিয়াম পালন করা। আর রমাদান হচ্ছে হিজরী বছরের মাসসমূহ হতে নবম মাস।

সিয়াম পালনের পদ্ধতি:

ভোর হওয়ার আগেই মুসলিম ব্যক্তি সিয়ামের নিয়ত করবে। তারপরে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী সম্বোগ -যৌন মিলন- থেকে দূরে থাকবে। সূর্যাস্ত হলে ইফতার করবে (সিয়াম ভঙ্গ করবে)। আর এভাবে রমাদানের মাস ব্যাপী করবে।এ সাওমের দ্বারা উদ্দেশ্য হবে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও তাঁর ইবাদত।

**সিয়াম পালনে অসংখ্য উপকারিতা রয়েছে।
তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ উপকারিতাগুলো হচ্ছে:**

- এটা আল্লাহর ইবাদত এবং তাঁর আদেশ পালন করা। বান্দা এক্ষেত্রে আল্লাহর জন্যই নিজের কাম-প্রবৃত্তি ও পানাহার থেকে বিরত থাকে, যা আল্লাহ তা'আলার তাকওয়া অর্জনের সর্বোত্তম উপায়।

- আর সিয়ামের স্বাস্থ্যগত, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উপকারিতাও অনেক বেশী, যা ঈমান ও আকীদা সঠিক

রেখে সিয়াম পালনকারীরাই কেবল উপলব্ধি করতে পারেন।
আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱۸۳﴾ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۸۴﴾ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِيُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِيُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْتُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۱۸۵﴾﴾ [البقرة: 183-185]

“হে মুমিনগণ ! তোমাদের জন্য সিয়ামের [১] বিধান দেয়া হল, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে দেয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা তাকওয়ার অধিকারী হতে পার। এগুলো নির্দিষ্ট কয়েক দিন। অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হলে [১] বা সফরে থাকলে [২] অন্য দিনগুলোতে এ সংখ্যা পূরণ করে নিতে হবে [৩]। আর যাদের জন্য সিয়াম কষ্টসাধ্য তাদের কর্তব্য এর পরিবর্তে ফিদ্বইয়া- একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করা [৪]। যদি কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৎকাজ করে তবে তা তার জন্য

কল্যাণকর। আর সিয়াম পালন করাই তোমাদের জন্য অধিকতর কল্যাণের যদি তোমরা জানতে। রমাদ্বান মাস, এতে কুরআন নাঘিল করা হয়েছে মানুষের হেদায়াতের জন্য এবং হিদায়াতের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে এ মাস পাবে সে যেন এ মাসে সিয়াম পালন করে [১]। তবে তোমাদের কেউ অসুস্থ থাকলে বা সফরে থাকলে অন্য দিনগুলোতে এ সংখ্যা পূরণ করবে [২]। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সহজ চান এবং তোমাদের জন্য কষ্ট চান না। আর যাতে তোমরা সংখ্যা পূর্ণ কর এবং তিনি তোমাদেরকে যে হিদায়াত দিয়েছেন সে জন্য তোমরা আল্লাহ্ মহিমা ঘোষণা কর এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৮৩-১৮৫]

সিয়ামের যেসব বিধিবিধান কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসসমূহে বলেছেন, তন্মধ্যে কয়েকটি হলো:

১- অসুস্থ ও মুসাফির ব্যক্তি সিয়াম ভঙ্গ করতে পারবে। তবে যে কয়দিন সিয়াম ভঙ্গ করবে, রমাদানের পরবর্তীতে তারা সেগুলোর কাযা করবে। অনুরূপভাবে হায়েয ও নিফাসগ্রস্ত নারীদের সিয়াম পালন সঠিক হবে না; বরং তারা হায়েয ও নিফাসের দিনগুলোতে সিয়াম ভঙ্গ করবে এবং পরবর্তীতে ঐ দিনগুলির কাযা করবে।

২- অনুরূপভাবে গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী নারী যখন তাদের নিজেদের অথবা তাদের সন্তানের ক্ষতির আশঙ্কা করবে, তখন তারাও সিয়াম ভঙ্গ করবে পরে কাযা করবে।

৩- যদি কোন সিয়াম পালনকারী ভুলক্রমে কোন কিছু খেয়ে ফেলে অথবা পান করে আর পরে সিয়ামের কথা মনে হয়, তাহলে তার সিয়াম বিশুদ্ধ হবে। কেননা ভুল-ভ্রান্তি ও জোর-যবরদস্তি জনিত কারণে কৃত বিষয়গুলোকে আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মাতের জন্য ক্ষমা করে দিয়েছেন। আর যদি মুখে কিছু থেকে থাকে, তাহলে তা ফেলে দেওয়া আবশ্যিক।

ইসলামের পঞ্চম রুকন: হজ্জ

পবিত্র বাইতুল্লাহতে জীবনে একবার হলেও (সামর্থবান ব্যক্তির) হজ্জ আদায় করা। যদি বেশী করে, তাহলে তা নফল হবে। হজেজর অগণিত উপকারিতা রয়েছে:

প্রথমত: এটি আল্লাহর জন্য সম্পাদিত আত্মিক, শারীরিক ও আর্থিক ইবাদত।

দ্বিতীয়ত: এতে পৃথিবীর সকল স্থানের মুসলিমদের একত্রিত হওয়া। তারা একই স্থানে মিলিত হয়, একই বেশ ধারণ করে, এক সময়ে একই রবের ইবাদত করে। শাসক ও শাসিত, ধনী ও গরীব, সাদা ও কালো কারো মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। প্রত্যেকেই আল্লাহর সৃষ্টি এবং তাঁরই বান্দা। মুসলিমদের মধ্যে পারস্পারিক পরিচয় ও সহযোগিতার সুযোগ তৈরি হয়। আর তাদের মধ্যে ঐ দিন সম্পর্কে অনুভূতি জাগ্রত হয়, যেদিন আল্লাহ তাদের সবাইকে হিসাবের জন্য একসাথে একই স্থানে পুনরুত্থান ঘটাবেন। ফলে তারা আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জন্য প্রস্তুত হয়।

মুসলিমদের কিবলা কা'বার চতুর্দিকে তাওয়াফ করা যে কা'বার দিকে মহান আল্লাহ মুখ করে সব সালাত আদায় করতে আদেশ করেছেন, তারা যেখানেই থাকুক না কেন। এছাড়াও নির্দিষ্ট সময়ে মক্কার অন্যান্য অবস্থানস্থলে -যেমন:

আরাফাতের ময়দান, মুযদালিফাহ ও মিনা- অবস্থান করা। আর উক্ত পবিত্র স্থানসমূহে তাওয়াফ ও অবস্থান করার উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত করা, ঠিক তিনি যেখানে যেভাবে তাওয়াফ ও অবস্থান করার আদেশ করেছেন।

স্বয়ং কা'বাসহ উক্ত স্থানসমূহ ও সৃষ্টিকুল কোনটিরই ইবাদত করা যাবে না। এগুলো কোন উপকার বা ক্ষতি কিছুই করতে পারে না। বরং ইবাদত তো শুধু এককভাবে আল্লাহর জন্যই। কারো উপকার ও ক্ষতি করার চূড়ান্ত ক্ষমতা শুধু আল্লাহরই। যদি আল্লাহ বাইতুল্লাহতে হজ্জ করতে আদেশ না করতেন, তাহলে মুসলিমদের জন্য সেখানে হজ্জ করা সঠিক হত না। কেননা ইবাদাত কখনো যুক্তি বা প্রবৃত্তি দ্বারা হতে পারে না। বরং ইবাদত আবশ্যিক হয় আল্লাহর কিতাবের আদেশের মাধ্যমে অথবা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহর মাধ্যমে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿..... وَ لِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتِطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا وَمَنْ كَفَرَ

فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٩٧﴾ [آل عمران: 97]

“এবং সামর্থ্যবান মানুষের উপর আল্লাহর জন্য বায়তুল্লাহর হজ্জ করা ফরয। আর যে কুফরী করে, তবে

আল্লাহ তো নিশ্চয় সৃষ্টিকুল থেকে অমুখাপেক্ষী।” [সূরা আলে-ইমরান, আয়াত: ৯৭] [৩৩]

সারা জীবনে কমপক্ষে একবার ‘উমরাহ করা মুসলিমদের ওপর ওয়াজিব, হোক তা হজ্জের সাথে বা অন্য সময়ে। মদীনাতে হজ্জের সাথে অন্য কোন সময়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদ ঘিয়ারত করা ওয়াজিব নয়। তবে এটি মুসতাহাব, ঘিয়ারতকারীর সাওয়াব হবে; তবে না করলে গুনাহগার হবে না। আর বর্ণিত হাদীস: “যে ব্যক্তি হজ্জ আদায় করল; অথচ আমাকে ঘিয়ারত করল না, সে আমাকে দূরে সরিয়ে দিল।” সহীহ নয়; বরং তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর মিথ্যাচার। [৩৪]

আর যে মসজিদের জন্য শরী‘আহ সফর বৈধ করেছে, যখন সেখানে পৌঁছাবে এবং তাহিয়্যাতুল মাসজিদের সালাত আদায় করবে, তখন তার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর ঘিয়ারত করা অনুমোদিত। সে السلام الله عليك يا رسول الله “আস-সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ” বলে নিম্নকণ্ঠে ও আদব সহকারে সালাম দেবো। তার কাছে কিছু চাইবে না, সালাম দিয়ে চলে যাবে; যেমনটি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উম্মাতকে

আদেশ করেছেন এবং যেমনটি সাহাবীগণ রাদিয়াল্লাহু আনহুম করেছেন।

অন্যদিকে যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরের কাছে তাদের সালাতে বিনীতভাবে দাঁড়ানোর মত দাঁড়ায়, তার কাছ থেকে তাদের প্রয়োজন মেটানোর প্রার্থনা করে, কোন বিপদ থেকে উদ্ধার করার কথা বলে অথবা আল্লাহর কাছে [ইবাদাতের ক্ষেত্রে] তাকে মাধ্যম হিসেবে গণ্য করে, এরা সকলেই মুশরিক তথা আল্লাহর সাথে শিরককারী। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের থেকে সম্পূর্ণ দায়মুক্ত। সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অথবা অন্য কোন ব্যক্তির সাথে এমন আচরণ করা থেকে প্রতিটি মুসলিম যেন সতর্ক থাকে। তারপরে সে আবু বাকর ও উমার রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমার কবরদ্বয় যিয়ারত করবে, তারপরে বাকী (গোরস্থান)-তে শায়িত ও শহীদদের কবরসমূহ যিয়ারত করবে। আর কবরবাসী মুসলিমদের শরয়ী যিয়ারতের পদ্ধতি হবে: যে ক্ষেত্রে যিয়ারতকারী মৃত ব্যক্তিদের উপরে সালাম পেশ করবে, তাদের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করবে এবং মৃত্যুকে স্বরণ করে সেখান থেকে প্রস্থান করবে।

হজ্জ ও উমরার পদ্ধতি:

হাজী প্রথমেই উত্তম হালাল পাথেয় যোগাড় করবেন। আর মুসলিম সর্বদাই হারাম উপার্জন হতে দূরে থাকবে; কেননা হারাম পাথেয় হজ্জআদায়কারীর ও দু'আকারীর হজ্জ এবং দু'আ প্রত্যাখ্যাত হওয়ার অন্যতম একটি কারণ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের এসেছে: كُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالْتَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ "অন্যায় (হারাম) উপার্জন হতে গঠিত প্রতিটি গোশতের জন্য জাহান্নামই উপযুক্ত স্থান।" [৩৫] আর সে ঈমানদ্বার ও তাওহীদপন্থীদের সহচর্য এখতিয়ার করবে।

মীকাতসমূহ

যখন সে মীকাতে পৌঁছবে, তখন সে সেখান থেকে ইহরাম বেধে নেবে, যদি সে গাড়ী অথবা অনুরূপ কিছুতে থাকে। আর যদি সে বিমানে থাকে, তাহলে মীকাত অতিক্রম করার আগেই মীকাতের নিকটবর্তী স্থানে ইহরাম বেধে নেবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব স্থান থেকে মানুষদেরকে ইহরাম বাঁধার আদেশ করেছেন, সেগুলো সংখ্যা পাঁচটি। তা হচ্ছে:

১- মদীনাবাসীদের জন্য যুল হুলাইফাহ (আবইয়ারে আলী)।

২- মরক্কো, মিশর ও সিরিয়াবাসীদের জন্য জুহফাহ (রাবেগের কাছাকাছি স্থান)।

৩- নাজদ, তায়েফ ও তাদের দিক থেকে আগতদের জন্য ক্বারনুল মানাঘিল (সাইল বা মাহরাম উপত্যকা)।

৪- ইরাকবাসীদের জন্য যাতু ইরক।

৫- ইয়ামানবাসীদের জন্য ইয়ালামলাম।

যারা এসব মীকাতের কোন একটি অতিক্রম করবে; অথচ সে তার অধিবাসী নয়, তাহলে তখন সেটিই তার মীকাত বলে গণ্য হবে, সেখান থেকেই সে ইহরাম বাঁধবে। মক্কার অধিবাসী ও মীকাতের মধ্যকার লোকেরা তাদের বাড়ি থেকেই ইহরাম বাঁধবে।

ইহরামের পদ্ধতি:

ইহরাম বাঁধার আগে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া, পবিত্রতা অর্জন করা ও সুগন্ধি ব্যবহার করা মুস্তাহাব। তারপরে মীকাতে যেয়ে ইহরামের কাপড় পরিধান করবে। বিমান যাত্রীরা তাদের নিজস্ব শহর থেকেই প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।

তারপরে যখন মীকাতের কাছাকাছি আসবে অথবা এর বরাবর আসবে তখন নিয়ত করে তালবিয়া পাঠ করবে [৩৬]। পুরুষের ক্ষেত্রে ইহরামের কাপড় হচ্ছে: সেলাইবিহীন একটি লুঙ্গি এবং চাদর, শরীরের সাথে তা জড়িয়ে রাখবে আর মাথা ঢাকবে না। তবে মহিলাদের ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট ইহরামের কাপড় নেই; বরং তার উপরে ওয়াজিব হচ্ছে এমন প্রশস্ত আবৃতকারী পোষাক পরিধান করা, যাতে মানুষ তাকে যে অবস্থাতেই দেখুক না কেন, কোন ফিতনার সুযোগ না ঘটে। ইহরাম বাঁধা অবস্থায় নারী তার মুখমণ্ডল ও দুই হাতে সেলাইকৃত কোন কিছু পরবে না, যেমন: বোরকা অথবা হাতমোজা। নিশ্চয় তার মাথার উপরে থাকা ওড়না দ্বারা সে তার মুখ ঢেকে নেবে, যখন সে পুরুষদেরকে দেখতে পাবে। যেমনটি করতেন উম্মাহাতুল মুমিনীন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের স্ত্রীগণ।

তারপরে যখন হজ্জ আদায়কারী ইহরামের পোষাক পরিধান করবে, তখন সে মনে মনে 'উমরাহ আদায়ের নিয়ত করবে, তারপরে তালবিয়া পাঠ করবে এভাবে: "আল্লাহুমা লাঝাইকা 'উমরাতান"। আর এতে করে তা তামাত্তু' [৩৭] প্রকারের হজ্জ হবে। তামাত্তু' হজ্জই সর্বোত্তম হজ্জ। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাহাবীদেরকে এ ব্যাপারে আদেশ করেছেন

এবং তাদেরকে বাধ্যতা আরোপ করেছিলেন। আর তার আদেশ পালনে বিলম্বকারীদের উপরে রাগান্বিতও হয়েছিলেন। তবে তার কথা ভিন্ন যে ব্যক্তির সাথে হাদী [৩৮] থাকবে। যেহেতু সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ন্যায় ফিরান হজ্জ আদায়কারী। ফিরান হজ্জ আদায়কারী: ঐ ব্যক্তি যে তার ইহরাম বাঁধার সময়ে তালবিয়াহ-তে বলে: “আল্লাহুমা লাক্বাইকা ‘উমরাতান ওয়া হাজ্জান”, এক্ষেত্রে সে কুরবানীর দিন তার পশু কুরবানীর আগে তার ইহরাম খুলবে না।

আর মুফরাদ হজ্জ আদায়কারী: যে শুধু হজ্জের নিয়ত করে আর তালবিয়াতে বলে: “আল্লাহুমা লাক্বাইকা হাজ্জান” তথা আমি আপনার দরবারে হজ্জ আদায়কারী হিসেবে উপস্থিত রয়েছি।

ইহরামকারীর জন্য হারাম বিষয়সমূহ:

মুসলিম ব্যক্তি ইহরামের নিয়ত করে ফেলার পরে তার উপরে নিম্নোক্ত কাজগুলো হারাম হয়ে যায়:

১- সহবাস ও এর প্রতি উদ্দীপনা সৃষ্টি করে এমন বিষয়, যেমন: চুম্বন করা, উত্তেজনার সাথে স্পর্শ করা অথবা এ সংক্রান্ত কথা বলা, নারীকে বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া, বিবাহের

আকদ সম্পন্ন করা। সুতরাং মুহরিম ব্যক্তি নিজে বিবাহ করবে না এবং অন্য কাউকে বিবাহ দিবে না।

২- চুল মুগুন করা অথবা চুলের কিছু অংশ কেটে ফেলা।

৩- নখ কেটে ছোট করা।

৪- মাথার সাথে লেগে থাকা কোন বস্তু দ্বারা মাথা ঢেকে রাখা। তবে ছাতা, তাঁবু অথবা গাড়ির ছায়া গ্রহণে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই।

৫- সুগন্ধি ব্যবহার করা অথবা তার ঘ্রাণ নেওয়া।

৬- স্থলভাগের কোন প্রাণী শিকার করা। সুতরাং মুহরিম ব্যক্তি কোন শিকার করবে না এবং তার প্রতি কোন ইঙ্গিতও করবে না।

৭- পুরুষের জন্য সেলাইকৃত কোন কাপড় পরিধান করা, আর নারীর ক্ষেত্রে তার মুখমণ্ডল ও দুই হাতের তালুতে কোন সেলাইকৃত কাপড় পরিধান করা। তবে পুরুষেরা স্যান্ডেল পরবে, আর যদি তা না পায়, তবে মোজা পরিধান করবে।

যদি এগুলোর মধ্য থেকে কোন একটি নিষিদ্ধ কাজ কেউ ভুলে অথবা না জেনে করে ফেলে, তাহলে সে তা দূর করে নেবে। এক্ষেত্রে তার উপরে কোন কিছু ওয়াজিব হবে না।

মুহরম ব্যক্তি যখন কা'বাতে এসে পৌঁছবে, তখন সে সাত চক্করে তাওয়াফে ক্ববুদুম [৩৯] করবে। হাজারে আসওয়াদের বরাবর থেকে শুরু করবে। এটি হচ্ছে তার 'উমরার তাওয়াফ। তাওয়াফের জন্য কোন নির্ধারিত দু'আ নেই। বরং সাধ্য মোতাবেক আল্লাহর যিকির করবে এবং দু'আ করবে [৪০]। এরপরে যদি সম্ভব হয়, তাহলে মাক্কামে ইবরাহীমের [৪১] পিছনে দুই রাকাত সালাত আদায় করবে। সুযোগ না থাকলে হারামের যে কোন স্থানে তা আদায় করবে। এরপরে সা'ঈ করার স্থানে [৪১] গমন করবে। সাফা পাহাড় থেকে সা'ঈ শুরু করবে। সেখানে উঠে কিবলামুখী হবে, তাকবীর (আল্লাহু আকবার) বলবে, তাহলীল (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ) বলবে এবং দু'আ করবে। তারপরে মারওয়ার দিকে সা'ঈ করবে, সেখানে উঠে কিবলামুখী হবে, তাকবীর (আল্লাহু আকবার) বলবে, আল্লাহর যিকির করবে এবং দু'আ করবে। এরপরে আবার সাফার দিকে সা'ঈ করবে এভাবে সাত চক্কর পর্যন্ত করতে থাকবে। সাফা থেকে মারওয়্যা পর্যন্ত যাওয়া এক চক্কর এবং আসা আরেকটি চক্কর হিসেবে গণ্য হবে। এরপরে সে তার মাথার চুল ছোট করবে। মহিলারা তাদের চুলের আগা থেকে আঙ্গুলের এক কর পরিমাণ কেটে ফেলবে। এতে করে তামাত্তু' হজ্জ আদায়কারীর 'উমরার কার্যক্রম শেষ হবে। তখন সে ইহরাম

খুলে হালাল হয়ে যাবে। আর ইহরামের কারণে সাময়িক হারাম বস্তুগুলো তার জন্য হালাল হয়ে যাবে।

যদি কোন নারী ইহরামের আগে অথবা পরে হায়িযগ্রন্থ হয়ে পড়ে অথবা সন্তান প্রসব হয়, তাহলে সে ফিরান হজ্জ আদায়কারী হিসেবে গণ্য হবে। তখন সে অন্যান্য হজ্জ আদায়কারীদের ন্যায় হজ্জ ও 'উমরাহর তালবিয়া পাঠ করবে। কেননা হায়িয ও নিফাস ইহরাম, বিভিন্ন মাশা'য়ির (আরাফাত, মুযদালিফা, মিনা ইত্যাদি) এ অবস্থান করার ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না। এ দুটি শুধু বাইতুল্লাহর তাওয়াফকে নিষিদ্ধ করে। সুতরাং উক্ত নারী তাওয়াফ ব্যতীত অন্য সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করবে। সে পবিত্রতা অর্জন পর্যন্ত তাওয়াফ করা বিলম্ব করবে। যদি সে অন্যান্য মানুষের হজ্জের ইহরাম বাঁধার ও মিনার দিকে গমনের আগেই পবিত্রতা অর্জন করে, তাহলে সে গোসল করে তাওয়াফ করবে। অতপর সা'ঈ করে চুল ছোট করে 'উমরার ইহরাম থেকে হালাল হয়ে যাবে। তারপরে অন্যান্য লোকেরা অষ্টম দিনে যখন হজ্জের ইহরাম বাঁধবে, তখন সেও ইহরাম বাঁধবে। আর যদি লোকেরা তার পবিত্র হওয়ার আগেই ইহরাম বেঁধে ফেলে, তাহলে সে ফিরান হজ্জ আদায়কারী হিসেবে গণ্য হবে। ইহরাম অবস্থায় থেকেই সে মানুষের সাথে তালবিয়া পাঠ করবে। আর মানুষের সাথে মিনাতে গমন, আরাফাত ও মুযদালিফাতে অবস্থান করা,

পাথর নিক্ষেপ করা, কুরবানী করা এবং কুরবানীর দিন চুল ছোট করা ইত্যাদি সব কিছু সমাপ্ত করবে। এরপরে যখন সে পবিত্রতা লাভ করবে তখন গোসল করে হজেজর তাওয়াফ সম্পাদন করবে এবং হজেজর সাঈ পালন করবে।

ঊমরাহ ও হজেজর ক্ষেত্রে এই একটি তাওয়াফই যথেষ্ট। যেটি উম্মুল মুমিনীন আয়িশাহ রাদিয়াল্লাহু আনহার সময়ে ঘটেছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জানিয়েছিলেন, পবিত্রতা অর্জনের পর তার তাওয়াফ ও সাঈ (একবার) হজ্জ ও ঊমরাহ উভয়ের ক্ষেত্রেই যথেষ্ট, যখন তিনি (আয়িশাহ) মানুষের সাথে তাওয়াফে ইফাদা ও সাঈ সম্পন্ন করেছিলেন। কেননা ঊমরাহ ও হজ্জ একসাথে মিলিয়ে ক্বিরান হজ্জ আদায়কারী ইফরাদ (এককভাবে হজ্জ আদায়) আদায়কারীর ন্যায়। তার জন্য শুধু একটি তাওয়াফ [৪৩] ও একটি সাঈ যথেষ্ট। যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়িশাহ রাদিয়াল্লাহু আনহাকে এ ব্যাপারে স্পষ্ট করেছেন এবং অন্য হাদীসেও এ ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী এসেছে: কিয়ামাত পর্যন্ত ঊমরাহ হজেজর মধ্যে প্রবেশ করেছে। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

তারপরে যখন যিলহজ্জ মাসের অষ্টম দিন আসবে, হাজীরা তাদের মক্কার অবস্থান থেকে হজেজর জন্য ইহরাম

বাঁধবে, যেভাবে তারা মীকাত থেকে ইহরাম বেঁধেছিল, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অর্জন করবে, তারপর ইহরামের পোষাক পরবে, এরপরে হাজী পুরুষ হোক বা নারী হোক নিয়ত করবে, এরপর এ বলে তালবিয়াহ পাঠ করবে: “আল্লাহুমা লাঝাইকা হাজ্জান”, আর তখন থেকে পূর্বে বর্ণিত সাময়িক নিষিদ্ধ কার্যক্রম থেকে সে দূরে থাকবে। যতক্ষণ না ইয়াওমুন নাহরে (কুরবানীর দিনে) [৪৪] মুযদালিফা থেকে মিনাতে ফিরে আসবে আর জামরাতুল আকাবাতে পাথর নিক্ষেপ করে পুরুষ হলে মাথা মুণ্ডন করবে এবং নারী হলে চুল ছোট করে ফেলবে (অর্থাৎ হালাল হয়ে যাবে)।

অষ্টম দিনে হাজী ইহরাম বাঁধার পর, হাজীদের সাথে মিনার উদ্দেশ্যে বের হবে। সেখানে রাত যাপন করবে, সেখানে দুই ওয়াক্তের সালাত একত্রিত না করে প্রতি ওয়াক্তের সালাত কসর (চার রাকাতের স্থানে দুই রাকাত) আদায় করবে। যখন আরাফাতের দিনে সূর্য উদয় হবে তখন হাজীদের সাথে নামিরার উদ্দেশ্যে রওনা হবে। সেখানে ইমামের সাথে অথবা সে যেখানে অবস্থান করবে সেখানেই যোহর ও আসরের সালাত একত্রিত করে জামা'আতে কসর করে একত্রে আদায় করবে। তারপরে সূর্য ঢলে পড়ার পরে আরাফাতের দিকে রওনা হবে। আর যদি কেউ মিনা থেকে সরাসরি আরাফাতে চলে যেয়ে সেখানে বসে, তবে তা

জায়িয হবে (অর্থাৎ আরাফাতে অবস্থান বিশুদ্ধ হবে)।
কেননা সম্পূর্ণ আরাফাতই অবস্থান করার স্থান।

হজ্জ আদায়কারী ব্যক্তি আরাফাতের ময়দানে বেশী বেশী পরিমাণে আল্লাহ তা'আলার যিকির, দু'আ এবং গোনাহের জন্য ক্ষমা চাইবে। সে কিবলাহর দিকে চেয়ে থাকবে, পাহাড়ের দিকে নয়। কেননা পাহাড় তো শুধু আরাফাতের একটি অংশ মাত্র। ইবাদাত মনে করে সেখানে আরোহণ করা সঠিক নয়। আবার [ইবাদাত মনে করে] পাহাড়ের পাথরসমূহ স্পর্শ করাও বৈধ নয়। কেননা এটি একটি হারাম বিদ'আত।

সূর্য ডুবে যাওয়ার আগ পর্যন্ত হাজীরা আরাফাত ত্যাগ করবে না। সূর্য ডোবার পর হাজীগণ মুযদালিফাহর দিকে রওনা দিবে। সেখানে পৌঁছানোর পর মাগরিব ও ইশার সালাত একত্রে বিলম্বে আদায় করবে। আর ইশার সালাত কসর করবে। সেখানে রাত্রি যাপন করে পরের দিন ফজর উদিত হলে, ফজরের সালাত আদায় করবে আর আল্লাহর যিকির করতে থাকবে। তারপরে তারা সূর্য উদিত হওয়ার আগেই মিনার দিকে রওনা হবে। যখন তারা মিনাতে পৌঁছবে, তখন সূর্য উদিত হওয়ার পরে জামরাতুল আকাবাতে সাতটি পাথর নিক্ষেপ করবে, যেগুলো ছেলার দানার মত হবে, ছোটও না আবার বড়ও না। সেখানে স্যান্ডেল নিক্ষেপ করা জায়িয নয়; কেননা এটি হচ্ছে

শয়তান কর্তৃক প্ররোচিত একটি খেল তামাশা। বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ ও তার সুন্যাহর অনুসরণের মধ্যে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যেগুলো হতে বিরত থাকতে বলেছেন, তা থেকে বিরত থাকাই প্রকৃতপক্ষে শয়তানের বেইজ্জতি [৪৫]।

পাথর নিষ্ক্ষেপের পরে হাজী তার কুরবানীর পশু যবাই করবে। তারপরে তার মাথা মুগুন করবে এবং নারী হলে চুল ছোট করবে। পুরুষেরা যদি চুল ছোট করে তা জায়েয। কিন্তু মুগুন করা তিনগুন উত্তম। তারপরে সে তার পোষাক পরে নেবে এবং শুধু স্ত্রীর কাছে গমন করা ব্যতীত ইহরাম অবস্থায় সাময়িক নিষিদ্ধ সব কিছু তার জন্য হালাল হয়ে যাবে। এরপরে সে মক্কাতে যেয়ে হজেজর তাওয়াফ করে সাঈ করবে। এর মাধ্যমে তার জন্য স্ত্রীসহ যাবতীয় বস্তু হালাল হয়ে যাবে। তারপরে সে পুনরায় মিনাতে ফিরে যাবে। সেখানে সে ঈদের দিনের বাকী অংশটুকু কাটাবে। তারপরে আরো দুইদিন ও দুইরাত মিনাতে ওয়াজিব হিসেবে অবস্থান করবে। এগারো ও বারো তারিখে সূর্য উদয়ের পরে তিনটি জামারাতে পাথর নিষ্ক্ষেপ করবে। প্রথমে মিনার কাছেই অবস্থিত ছোট জামারাতে পাথর নিষ্ক্ষেপ শুরু করবে, তারপরে মধ্যমা জামারাতে, এরপরে জামরাতুল আকাবাতে, যেখানে ঈদের দিনে পাথর নিষ্ক্ষেপ করেছিল। প্রত্যেক জামারাতে সাতটি করে পাথর নিষ্ক্ষেপ করবে। প্রতিটি পাথর

নিষ্ক্ষেপের সময়ে তাকবীর বলবে। আর মিনাতে তার অবস্থানের স্থান [৪৬] থেকে পাথরগুলো সংগ্রহ করবে। যে ব্যক্তি মিনাতে অবস্থানের জায়গা পাবে না, সে তাবুসমূহের শেষ প্রান্তে অবস্থান করবে।

যদি কেউ বারো তারিখে পাথর নিষ্ক্ষেপের পরে মিনা থেকে চলে যেতে চায়, তাহলে সেটা বৈধ। আর যদি তেরো তারিখ পর্যন্ত সেখানে বিলম্ব করে, তা উত্তম। সূর্য চলে পড়ার পাথর নিষ্ক্ষেপ করবে। যদি কেউ সফর করতে চায়, তাহলে সে বাইতুল্লাহতে বিদায়ী তাওয়াফ সেরে নেবে। এরপর সেখান থেকে দ্রুত সফরে বের হবে। হায়িয ও নিফাসগ্রস্ত নারী যদি হজেজর তাওয়াফ ও সাঈঈ করে থাকে, তাহলে তাকে বিদায়ী তাওয়াফ করতে হবে না।

যদি হাজী কুরবানীর পশু যবাই করতে এগারো বা বারো বা তেরো তারিখ পর্যন্ত বিলম্ব করে, তা তার জন্য জায়িয। আর যদি হজেজর তাওয়াফ ও সাঈঈ মিনা থেকে আসা পর্যন্ত বিলম্ব করে, তাও জায়িয। তবে যেভাবে পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে, সেভাবে করাই উত্তম।

আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন। আমাদের নবী মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিজনের উপরে রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক।

ঈমান

আল্লাহ তা'আলা মুসলিমের ওপর তার প্রতি ও তার রাসূলের প্রতি এবং ইসলামের রুকনসমূহের প্রতি ঈমান আনার সাথে সাথে তাঁর ফিরিশতগন [৪৭], তাঁর রাসূলগণের ওপর নাযিলকৃত কিতাবসমূহের [৪৮]ওপর ঈমান আনা আবশ্যিক করেছেন। কুরআন নাযিল দ্বারা যে কিতাবসমূহের পরিসমাপ্তি করেছেন, পূর্বের কিতাবসমূহকে রহিত করেছেন এবং সংরক্ষক বানিয়েছেন। তিনি আরো আবশ্যিক করেছেন যে, মুসলিমরা প্রথম থেকে শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সকল রাসূলদের উপরে ঈমান আনা। কেননা তাদের রিসালাত এক, দীন এক। তা হল ইসলাম, তাদেরকে প্রেরণকারী এক, তিনি হচ্ছেন মহাজগতের রব আল্লাহ। সুতরাং মুমিনের জন্য এ কথা বিশ্বাস করা অত্যাবশ্যিক যে, যে সকল রাসূলদের কথা আল্লাহ কুরআনে উল্লেখ করেছেন, তারা সকলেই তাদের উম্মাতের প্রতি প্রেরিত আল্লাহর রাসূল, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাসূলদের শেষ রাসূল, সকল মানুষের প্রতি প্রেরিত আল্লাহর রাসূল। তার নবুওয়াত পাওয়ার পর সকল মানুষ তার উম্মাত, এমনকি ইহুদী, খৃষ্টান ও অন্যান্য দীনের অনুসারীরাও; কেননা পৃথিবীর সকল মানুষই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াল্লামের উম্মাত। আল্লাহর পক্ষ হতে তার অনুসরণ করা তাদের জন্য বাধ্যতামূলক।

যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুসরণ করে না এবং ইসলামেও প্রবেশ করে না এমন লোকদের থেকে মূসা ও ঈসা আলাইহিমুস সালামসহ সকল রাসূলগণ দায়মুক্ত। কেননা মুসলিম মাত্রই সকল রাসূলের উপরে ঈমান রাখে এবং তাদেরকে অনুসরণ করে। আর যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে ঈমান আনেনি, তার অনুসরণ করেনি এবং ইসলামেও প্রবেশ করেনি, সে সমস্ত রাসূলদেরকেই মিথ্যা প্রতিপন্নকারী। যদিও সে দাবী করে যে, সে তাদের কারো অনুসরণকারী। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আল্লাহর বাণী হতে এ কথার দলীল বর্ণনা করা হয়েছে।

রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “যার হাতে মুহাম্মদের জীবন, তার কসম করে বলছি, এ উম্মাতের যে কেউ, চাই সে ইহুদী হোক বা খৃস্টান হোক আমার আগমনের সংবাদ পাওয়ার পর সে আমি যে বিষয়াবলী নিয়ে প্রেরিত হয়েছে, তার প্রতি ঈমান না এনে মারা যাবে, সে অবশ্যই জাহান্নামী হবে।” [৪৯]

মুসলিমের উপরে আরো আবশ্যিক যে, সে ঈমান আনবে মৃত্যুর পরে পুনরুত্থান, হিসাব, প্রতিদান, জান্নাত ও

জাহান্নাম সম্পর্কে। আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত তাকদীরের উপরেও ঈমান আনবে।

তাকদীরের উপর ঈমান আনার অর্থ:

একজন মুসলিম এ আকীদা পোষণ করবে যে, আল্লাহ তা'আলা সব কিছু আগ থেকেই জানেন। আসমান ও জমিন সৃষ্টির আগ থেকেই তিনি বান্দার কর্মসমূহ জানেন এবং তা তাঁর নিকটে লাউহে মাহফুযে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। একজন মুসলিম জানে যে, আল্লাহ তা'আলা যা চান, তা হয়, আর তিনি যা চান না, তা হয় না। আর আল্লাহ তা'আলা বান্দাদেরকে তার আনুগত্যের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি তা তাদেরকে স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, তাদেরকে আদেশ করেছেন এবং তিনি অবাধ্যতা থেকে তাদের নিষেধ করেছেন। আর সেগুলোও তাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। তাদের জন্য ক্ষমতা ও ইচ্ছা নির্ধারণ করেছেন, যদ্বারা সে আল্লাহর আদেশসমূহ পালন করতে পারে; এতে তার সাওয়াব হাসিল হয়। আর যে তাঁর অবাধ্যতায় লিপ্ত হবে, সে শাস্তির উপযুক্ত হবে।

বান্দার চাওয়া আল্লাহ তা'আলার চাওয়ার অধীন। আর যে সমস্ত বস্তু আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য নির্ধারণ করেননি তা চাওয়া অনুযায়ী পছন্দ অনুযায়ী নয়। তবে তাদের ইচ্ছা বাহিরে তাদের ওপরে যা আপতিত হয়, যেমন: ভুল করা,

ভুলে যাওয়া, ইচ্ছার বিরুদ্ধে জবরদস্তিভাবে করানো কাজ, অনুরূপভাবে দরিদ্রতা, অসুস্থতা ও বিপদাপদ ইত্যাদি। এ সব বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে পাকড়াও করবেন না এবং কোন শাস্তিও দিবেন না। বরং দরিদ্রতা, অসুস্থতা ও বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করলে এবং আল্লাহর ফয়সালার উপরে সন্তুষ্ট থাকলে সাওয়াব দেবে।

ইতিপূর্বে যা কিছু আলোচনা করা হয়েছে এর প্রতিটি বিষয়ের উপরে মুসলিমের ঈমান আনা আবশ্যিক।

আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখার ক্ষেত্রে সবচেয়ে সম্মানিত মুসলিম, তার নিকটভাজন এবং জান্নাতে সর্বোত্তম স্থানের অধিকারী হচ্ছেন: মুহসিনগণ, যারা এমনভাবে আল্লাহর ইবাদাত করে, তাঁকে সম্মান দেয় এবং তাঁর ভয়ে বিনীত হয় যেন তারা তাঁকে দেখছেন। গোপনে বা প্রকাশ্যে তার নাফমামী করে না। আর এ বিশ্বাস রাখে যে, তারা যেখানেই থাকুক না কেন, আল্লাহ তাদেরকে দেখছেন, তাদের কাজকর্ম, কথাবার্তা ও নিয়ত সংক্রান্ত কোন বিষয়ই তাঁর কাছে গোপন নয়। এ কারণে তারা তাঁর আদেশের অনুসরণ করে। তাঁর অবাধ্যতা পরিত্যাগ করে। যখনই তাদের কারো কাছ থেকে আল্লাহর আদেশ বিরোধী কোন ভুল-ভ্রান্তি হয়ে যায়, তখনই অতিদ্রুত আল্লাহর কাছে প্রকৃত অর্থে তাওবা

করে আর তার ভুলের ওপর অনুতপ্ত হয়। আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়, তার পুনরাবৃত্তি করে না। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ [النحل: 128]

“নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সঙ্গে আছেন যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যারা মুহসিন।” [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ১২৮।]

দীন ইসলামের পূর্ণতা

মহিমান্বিত কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿... أَلْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَأَخْشَوْنَ الْيَوْمَ
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ
دِينًا...﴾ [المائدة: 3]

“আজকের দিন আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করলাম। আর তোমাদের ওপর আমার নি'আমতকে সম্পন্ন করলাম। আর ইসলামকে তোমাদের জন্য দীন হিসেবে মনোনিত করলাম।” [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত : ৩]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেছেন,

﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ

الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا﴾ [الإسراء: 9]

“নিশ্চয়ই এ কুরআন হিদায়াত করে সে পথের দিকে যা আকওয়াম (সরল, সুদৃঢ়) এবং সৎকর্মপরায়ণ মুমিনদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।” [সূরা আল-ইসরা, আয়াত : ৯]

মহাপ্রতাপশালী আল্লাহ কুরআন সম্পর্কে বলেছেন:

﴿... وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى

لِّلْمُسْلِمِينَ﴾ [النحل: 89]

“আর আমরা তোমার প্রতি নাযিল করেছি কিতাব, যা প্রতিটি বস্তুর স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ, হিদায়াত, রহমত ও সুসংবাদ রয়েছে মুসলিমদের জন্য।” [সূরা আন-নাহাল, আয়াত : ৮৯]

সহীহ হাদীসে হাদীসে রয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “আমি তোমাদেরকে একটি উজ্জ্বল পথে রেখে যাচ্ছি, যার রাত দিনের মতই। আমার পরে দুর্ভাগা ব্যতীত অন্য কেউ তা থেকে বিচ্যুত হতে পারে

না।” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন, “আমি তোমাদের মধ্যে দুটি বিষয়কে রেখে গেলাম, যতক্ষণ তোমরা তা আঁকড়ে ধরে থাকবে, তোমরা কখনোই পথচ্যুত হবে না, তা হল: আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর নবীর সুনাত।” [৫১]

পূর্বে উল্লেখিত আয়াতসমূহে:

প্রথম আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি মুসলিমদের জন্য তাদের দীন ইসলামকে পরিপূর্ণতা দান করেছেন। এতে কখনো কোন ঘাটতি থাকবে না, কখনো কোন কিছু এতে যোগ করাও প্রয়োজন হবে না। এটি সকল জাতি, স্থান ও সময়ের জন্যই উপযুক্ত। তিনি আরো সংবাদ দিয়েছেন যে, এ মহান, পরিপূর্ণ ও মহানুভবতার দীন, সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাত এবং ইসলামকে বিজয় দান এবং মুসলিমদেরকে তাদের শত্রুদের ওপর সাহায্য করার মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর নিয়ামাতকে পরিপূর্ণ করেছেন। তিনি আরো সংবাদ দিয়েছেন যে, মানুষের দীন হিসেবে তিনি ইসলামের ওপরে সন্তুষ্ট হয়েছেন। সুতরাং তিনি কখনো অসন্তুষ্ট হবেন না। আর কারো কাছ থেকে ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দীনকে গ্রহণ করবেন না।

দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ তাআলা জানিয়েছেন যে, কুরআন হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ একটি পথনির্দেশ। এতে দীন ও দুনিয়ার বিষয়সমূহের সমাধানমূলক সত্য বক্তব্য রয়েছে। প্রতিটি ভালো কাজের প্রতি এটি নির্দেশনা দিয়েছে এবং প্রতিটি মন্দ কাজ থেকে তা সতর্ক করেছে। অতীতে, বর্তমানে ও ভবিষ্যতের যে কোন সমস্যার ইনসাফপূর্ণ সঠিক সমাধান রয়েছে এ কুরআনে। অন্যদিকে কুরআনের সমাধানের বিপরীতে যত সমাধানই থাকুক, তা হচ্ছে অন্ধকার ও মূর্খতা।

সুতরাং জ্ঞান, আকীদাহ, বিচার-ফয়সালা সংক্রান্ত নিয়ম কানুন, মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিদ্যা, দণ্ডবিধিসহ মানুষ যেসব বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবে তার সব কিছুই আল্লাহ নিজে কুরআনে এবং তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষাতে (হাদীসে) পরিপূর্ণভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন, যেভাবে আল্লাহ তাআলা এ ব্যাপারে উক্ত আয়াতের মধ্যে সংবাদ দিয়েছেন। এমনকি তিনি আরো সংবাদ দিয়েছেন:

﴿... وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيِينًا لِكُلِّ شَيْءٍ...﴾ [النحل: 89]

“আর আমি তোমার উপরে কিতাব নাযিল করেছি, প্রতিটি বিষয়ের সুস্পষ্ট বর্ণনা স্বরূপ।” [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৮৯]

পরবর্তী অধ্যায়ে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ, অবিচল
ও সার্বজনীন পথনির্দেশনা নিয়ে সুস্পষ্ট সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
রয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়: ইসলামের পথ-পদ্ধতি

প্রথমত: ইলম (জ্ঞানার্জন) সংক্রান্ত বিষয়ে:

প্রথম যে বিষয়টি আল্লাহ তা'আলা মানুষের উপরে ফরয করেছেন, তা হচ্ছে জ্ঞানার্জন করা বা ইলম শিক্ষা করা। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ

يَعْلَمُ مُتَقَلِّبِكُمْ وَمَثْوَكُمْ ﴿١٩﴾ [محمد: 19]

“সুতরাং জেনে রেখ, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্য ইলাহ নেই। আর ক্ষমা প্রার্থনা কর তোমার ও মুমিন নর-নারীদের ক্রটির জন্য। আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি এবং অবস্থান সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন।” [সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত: ১৯]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেন,

﴿... يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾ [المجادلة: 11]

“তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় উন্নত

করবেন; আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।” [সূরা আল-মুজাদালাহ, আয়াত : ১১]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেছেন,

﴿... وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ [طه: 114]

“আর তুমি বল, হে আমার রব, আমার ইলম বৃদ্ধি করে দিন।” [সূরা ত্বহা : ১১৪]

বলেছেন: “প্রত্যেক মুসলিমের উপরে ইলম অন্বেষণ করা ফরয।” [৫২] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন: “পূর্ণিমার রাতে সমস্ত নক্ষত্ররাজীর উপরে চাঁদের মর্যাদা যেমন, ইবাদাতকারী ব্যক্তির উপরে আলিমের মর্যাদাও ঠিক তেমন।” [৫৩]

ইসলামে আবশ্যিকতার দিক থেকে ইলম বা জ্ঞান কয়েক প্রকার:

প্রথম প্রকার: ফরযে লাঘিম: যা পুরুষ হোক অথবা নারী, সকল মানুষের উপরেই তা অত্যাবশ্যকীয় ফরয। এ ব্যাপারে অজ্ঞতার ওষর কারো থেকে গ্রহণ করা হবে না। আর তা হল: আল্লাহ তা‘আলাকে জানা, তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানা এবং দীন ইসলামের আবশ্যকীয় পালনীয় বিষয়সমূহ জানা। [৫৪]

দ্বিতীয় প্রকার: ফরযে কিফায়াহ: যখন এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক থাকবে, তখন বাকীদের থেকে এর দায়িত্ব (পালন না করার গোনাহ) রহিত হয়ে যায়। তখন বাকীদের উপরে এটি ওয়াজিব নয়; বরং মুস্তাহাব পর্যায়ের দায়িত্ব হয়ে যায়। এটা হচ্ছে ইসলামী শরী'আতের আহকাম সংক্রান্ত এমন ইলম যা তার ধারণকারীকে শিক্ষাদান, বিচার-ফয়সালা এবং ফাতওয়া প্রদানের যোগ্য বানিয়ে দেয়। অনুরূপভাবে মুসলিমদের জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে বিভিন্ন আবশ্যিকীয় পেশা ও শিল্পের জ্ঞান অর্জন করা। সুতরাং যখন তাদের জীবন ধারণের জন্য জরুরী এমন ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমাণ লোক না থাকে, তখন মুসলিমদের শাসক উক্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি তৈরী করবেন, যেন এর মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক পাওয়া যায়।

দ্বিতীয়ত: আকীদা সংক্রান্ত বিষয়ে:

আল্লাহ সুবহানা'ল্ ওয়া তা'আলা তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লা'ল্ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আদেশ করেছেন যে, তিনি যেন সমস্ত মানুষের কাছে ঘোষণা করে দেন যে, তারা এক আল্লাহর বান্দা। আর তাই তাদের উপরে আবশ্যিক হচ্ছে, তারা এককভাবে আল্লাহর ইবাদাত করবে। তাদেরকে আরো আদেশ করেছেন যে, তারা যেন তাঁর ইবাদতের ক্ষেত্রে কোন মাধ্যম অবলম্বন করা ছাড়াই আল্লাহর সাথে

সরাসরি সম্পর্ক গড়ে তুলে। لا اله الا الله (আল্লাহ ছাড়া কোন প্রকৃত ইলাহ নেই) এর অর্থ বর্ণনা করার সময়ে যেমনটি বর্ণিত হয়েছে। তিনি আরো আদেশ করেছেন যে, তারা যেন শুধু তাঁর উপরেই তাওয়াক্কুল (ভরসা) করে। তাঁকে ছাড়া কারো কাছ থেকে ভয় না পায়। তাঁর কাছে ছাড়া আর কারো কাছে কিছু আশা না করে [৫৫]। কেননা তিনিই শুধুমাত্র উপকার ও ক্ষতি করতে পারেন। এছাড়া তিনি আরও আদেশ করেছেন যে, তারা তাঁকে পূর্ণতার সিফাতের মাধ্যমে গুণান্বিত করবে, ঐ সমস্ত গুণ, যেগুলো দ্বারা আল্লাহ নিজেকে অথবা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে গুণান্বিত করেছেন, যার বর্ণনা ইতোপূর্বে গত হয়েছে।

তৃতীয়ত: মানুষের মধ্যকার সম্পর্ক সংক্রান্ত বিষয়ে:

আল্লাহ মুসলিমকে একজন উত্তম মানুষ হতে আদেশ করেছেন। সে চেষ্টারত থাকবে মানবসমাজকে কুফুরীর অন্ধকার থেকে মুক্তি দিয়ে ইসলামের আলোর পথে নিয়ে আসার। আর এ কারণেই আমি আমার প্রতি আরোপিত দায়িত্ব হতে কিছুটা পালনার্থে এ বইটি লিখেছি ও তা প্রচার করেছি।

আল্লাহ তা'আলা আদেশ করেছেন যে, মুসলিম একজন ব্যক্তির সাথে অন্য মুসলিমের সম্পর্ক হবে আল্লাহর প্রতি

ঈমানের ভিত্তিতে। সুতরাং সে আল্লাহ তা'আলার নেককার বান্দাদেরকে ভালোবাসবে, যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের অনুগত; যদিও তারা আত্মীয়তার দিক থেকে [তার] দূরবর্তী সম্পর্কের হোক না কেন। পক্ষান্তরে সে আল্লাহর সাথে কুফরীতে লিপ্ত এবং আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণকারী ব্যক্তিকে ঘৃণা করবে; যদিও তারা তার নিকটাত্মীয় হোক না কেন। আর এই সম্পর্কই হচ্ছে এমন সম্পর্ক যা বিভিন্ন মতাদর্শকে একত্রিত করতে পারে এবং পরস্পর মতভেদে লিপ্ত থাকা ব্যক্তিদের মধ্যেও সম্প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে। বংশগত সম্পর্ক, দেশ অথবা বস্তুগত অন্য কোন সম্পর্ক ঠিক এর বিপরীত; কেননা তা অচিরেই নষ্ট হয়ে যায়।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ...﴾ [المجادلة: 22]

“আল্লাহর উপরে এবং আখিরাতের উপরে ঈমান এনেছে তুমি এমন কোন কওমকে পাবে না, যারা এমন কাউকে আন্তরিকভাবে ভালোবাসবে যে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। যদিও তারা তার পিতা, অথবা তাদের সন্তান, অথবা তাদের ভাই, অথবা

তাদের পরিবার-পরিজন হোক না কেন।” [সূরা আল-মুজাদালাহ, আয়াত: ২২]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেছেন,

﴿... إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَلُّكُمْ...﴾ [الحجرات: 13]

“নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি হচ্ছে সবচেয়ে বেশী তাকওয়া অর্জনকারী।” [সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ১৩]

প্রথম আয়াতে আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা‘আলা জানাচ্ছেন যে, আল্লাহর প্রতি ঈমানদার ব্যক্তি আল্লাহর শত্রুদেরকে ভালোবাসতে পারে না; যদিও তারা তার নিকটাত্মীয় হয়।

দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা‘আলা জানাচ্ছেন যে, মানুষের মধ্যে তাঁর কাছে সর্বোত্তম এবং প্রিয়ভাজন হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে তাঁর অনুগত। সে ব্যক্তি যে গোত্র বা বর্ণেরই হোক না কেন।

তবে আল্লাহ তা‘আলা বন্ধু এবং শত্রু প্রত্যেক ব্যক্তির সাথেই ইনসাফের আদেশ করেছেন। তিনি তাঁর নিজের উপর জুলুমকে হারাম করেছেন এবং যুলুম করাকে তাঁর বান্দাদের মধ্যেও হারাম করেছেন। তিনি সত্য এবং

আমানতের ব্যাপারে আদেশ করেছেন এবং খেয়ানতকে হারাম করেছেন। তিনি আদেশ দিয়েছেন- পিতা-মাতার সাথে সদ্যবহারের, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার ব্যাপারে, দরিদ্রদের প্রতি ইহসান করার ব্যাপারে এবং সৎকাজে পারস্পারিক অংশীদার হওয়ার ব্যাপারে। আর তিনি প্রতিটি বস্তুর প্রতিই ইহসানের আদেশ করেছেন; এমনকি পশু-প্রাণীদের প্রতিও। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে কষ্ট দেওয়া হারাম করেছেন এবং তাদের প্রতি ইহসানের আদেশ করেছেন [৫৬]। পক্ষান্তরে ক্ষতিকর প্রাণীসমূহ যেমন পাগলা কুকুর [৫৭], সাপ, বিচ্ছু, ইঁদুর, চিল অথবা গিরগিটি এগুলোকে হত্যা করা যাবে; যেন এর অনিষ্ট থেকে রেহাই পাওয়া যায়। তবে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া ব্যতিরেকে হত্যা করতে হবে।

চতুর্থত: মুরাকাবা বিষয়ে এবং মুমিন ব্যক্তির জন্য অন্তরগত উপদেশকারী:

কুরআনের আয়াতসমূহ মানুষকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়েছে যে, তারা যেখানেই থাকুক না কেন আল্লাহ তাদেরকে দেখছেন, তিনি তাদের সকল আমল ও নিয়ত সম্পর্কে জানেন। তিনি তাদের সকল কর্ম ও কথার হিসাব রাখেন। তাঁর ফেরেশতারা তাদের দায়িত্বে নিয়োজিত, প্রকাশ্যে অথবা গোপনে যাইহোক না কেন তারা তা লিখছেন। আর

আল্লাহ তা'আলা অর্চীরেই তাদের যাবতীয় কথা ও কাজের হিসাব নিবেন। যদি তারা এই দুনিয়াতে তার অবাধ্যতায় লিপ্ত হয় এবং তার আদর্শের বিরোধিতা করে, তিনি তাঁর কঠোর আযাবের হুশিয়ারী দিয়েছেন। আর ঈমানদারদের জন্য এটাই সবচেয়ে বড় ধমক, যা তাদেরকে তাঁর অবাধ্যতায় লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত রাখবে। সুতরাং তারা আল্লাহর ভয়ে অপরাধ ও বিরোধিতা করাকে পরিত্যাগ করে।

পক্ষান্তরে এমন ব্যক্তি যে আল্লাহকে ভয় করে না এবং যখনই সে সুযোগ পায় পাপ কাজে লিপ্ত হয়, এমন ব্যক্তির জন্যও আল্লাহ তা'আলা একটি হৃদ (সাজা) এর ব্যবস্থা করেছেন, যা তাকে এই জীবনে [অন্যায় থেকে] বিরত রাখবে। তা হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মুসলিমদেরকে সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করার আদেশ করেছেন। সুতরাং প্রত্যেক মুসলিম এটা অনুভব করবে, সে আল্লাহর সামনে জিজ্ঞাসিত হবে অন্যের কৃত ভুলের জন্য যা অন্যরা তার সামনে করছে; কিন্তু সে তাকে যদি হাত দিয়ে বাধা দেওয়ার সামর্থ্য না থাকে তবে মুখ দ্বারা নিষেধ করতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও তাকে নিষেধ করেনি। আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদের শাসককে [৫৮] নির্দেশ দিয়েছেন, সে যেন আল্লাহর হৃদসমূহকে [শরী'আত কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি] অপরাধীদের উপরে বাস্তবায়ন করতে। আর হৃদ হচ্ছে অপরাধের স্তর অনুযায়ী অপরাধীকে শাস্তি প্রদান,

এমনভাবে যা আল্লাহ তা'আলা কুরআনের মধ্যে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাদীসসমূহে বর্ণনা করেছেন। এছাড়াও তিনি আদেশ করেছেন অপরাধী ব্যক্তিদের উপরে এর প্রয়োগ করার জন্য, যেন এর মাধ্যমে ইনসাফ, নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ ছড়িয়ে পড়ে।

পঞ্চমত: সামাজিক সহযোগিতা ও পারস্পারিক দায়িত্ববোধ সংক্রান্ত ব্যাপারে:

আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদেরকে বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্যের জন্য আদেশ করেছেন, যেমনটি যাকাত ও সদকাহর অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা কোন মানুষকে যেকোনো ধরনের কষ্ট দেওয়াকে মুসলিমের উপরে হারাম করেছেন। এমনকি রাস্তায় কষ্টদায়ক বস্তুকেও তিনি হারাম করেছেন এবং মুসলিম ব্যক্তিকে আদেশ করেছেন সে যখন তা দেখতে পাবে, তা যেন দূর করে, যদিও সে কষ্টদায়ক বস্তুটি অন্য কোন ব্যক্তি সেখানে রেখে থাকে। আর এতেও তাকে পুরস্কারের ওয়াদা করা হয়েছে, যেমনিভাবে কষ্ট প্রদানকারী ব্যক্তিকে শাস্তির ওয়াদা করা হয়েছে।

আর আল্লাহ তা'আলা মুমিন ব্যক্তির উপরে ফরজ করেছেন, সে যেন তার ভাইয়ের জন্য সেটাই ভালোবাসে, যা

সে তার নিজের জন্য ভালোবাসে এবং সে তার জন্য সেটাই অপছন্দ করে যা তার নিজের জন্য অপছন্দ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا

اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾ [المائدة: 2]

“তোমরা নেককাজ এবং তাকওয়ার ব্যাপারে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য কর। তবে সীমা লঙ্ঘন পাপাচারের ক্ষেত্রে একে অপরকে সাহায্য করো না। আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ আযাব প্রদানে অত্যন্ত কঠোর” [সূরা আল-মায়দাহম আয়াত: ২]

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ...﴾ [الحجرات: 10]

“নিশ্চয়ই মুমিনগণ পরস্পর পরস্পরের ভাই। সুতরাং তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে বিবাদমান বিষয়ের সংশোধন করে দাও।” [সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ১০]

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ
 بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا
 عَظِيمًا ﴾ [النساء: 114]

“তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোন কল্যাণ নেই, তবে কল্যাণ আছে, যে নির্দেশ দেয় সদকাহ, সৎকাজ ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের; আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় কেউ তা করলে তাকে অবশ্যই আমরা মহা পুরস্কার দেব।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১১৪]

রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “তোমাদের কেউ প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য সেটাই পছন্দ করবে, যা তার নিজের জন্য পছন্দ করে।” [৫৮] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর শেষ জীবনের বিদায় হজের মাঠে প্রদত্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাষণে [৬০] ইতোপূর্বে আদেশকৃত বিষয়ের উপরে তাকিদ প্রদান করে বলেছিলেন: যা ইমাম আহমাদ রহ. বর্ণনা করেছেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ
 عَلَى أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَى
 أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى، أَبْلَغْتُ ؟

“হে মানবজাতী, নিশ্চয়ই তোমাদের রব এক, তোমাদের পিতা এক, মনে রাখবে, আরবের জন্য অনারবের, অনারবের জন্য আরবের উপরে কোন মর্যাদা নেই। কোন কালোর উপর কোন লাল ব্যক্তির এবং লাল ব্যক্তির উপর কালো ব্যক্তির কোন মর্যাদা নেই, শুধুমাত্র তাকওয়া দ্বারা। আমি কি তা পৌঁছে দিয়েছি?” তারা বললেন: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৌঁছে দিয়েছেন। [৬১] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন:

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، إِلَى يَوْمٍ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟

“নিশ্চয়ই তোমাদের জান, মাল ও ইজ্জত তোমাদের উপর আজকের এই দিনের মতো হারাম। তোমাদের এই দেশে এবং এই মাসে। যতদিন না তোমরা আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে। আমি কি তা পৌঁছে দিয়েছি?” তারা বললেন: জ্বী। তখন তিনি আঙ্গুলকে আসমানের দিকে উঁচা করে বললেন:

أَللَّهُمَّ اشْهَد

“হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন।”

ষষ্ঠত: আভ্যন্তরীণ রাজনীতি বিষয়ে:

আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদেরকে তাদের নিজেদের উপরে একজনক ইমাম নির্ধারণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। তারা রাষ্ট্র সংক্রান্ত ব্যাপারে তার কাছে বাই'আত নিবে। তারা তার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ থাকবে, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবে না। ফলে তারা একটি উম্মাতে (জাতিতে) পরিণত হবে। আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতার নির্দেশ ব্যতীত অন্য সব বিষয়ে তারা তাদের ইমাম ও দায়িত্বশীলদের আনুগত্য করবে; কিন্তু আল্লাহর নাফরমানির আদেশে আনুগত্যতা নয়। কেননা স্রষ্টার অবাধ্যতায় কোন মাখলুকের আনুগত্য করা যাবে না।

আল্লাহ তা'আলা মুসলিমকে আদেশ করেছেন, যখন সে এমন দেশে থাকবে যেখানে দীন ইসলাম প্রকাশ করতে এবং দীনেরে দিকে দাওয়াত দিতে পারে না, তখন [৬৩] সে ইসলামী কোন রাষ্ট্রে হিজরত করবে। আর ইসলামী রাষ্ট্র হচ্ছে এমন রাষ্ট্রসমূহ, যেখানে প্রতিটি কাজে ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক ফয়সালা করা হয় এবং মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী বিচার ফয়সালা করেন।

সুতরাং ইসলাম কোন নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখা, জাতীয়তাবাদ, অথবা সাম্প্রদায়িকতাকে স্বীকার করে না। বরং মুসলিমদের জাতীয়তা হচ্ছে ইসলাম। বান্দারা হচ্ছে

আল্লাহর বান্দা। জমিন আল্লাহর জমিন। কোন বাধা বিপত্তি ছাড়া যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেতে পারবো। শর্ত হলো আল্লাহর শরী'আতকে পালন করা। আর যখন কোন বিষয়ে তা অমান্য করবে তখন তার উপরে আল্লাহর হুকুম প্রযোজ্য হবে। আল্লাহর শরী'আত অনুযায়ী কাজ করা এবং তাঁর হৃদসমূহকে কায়ম করার মধ্যেই রয়েছে নিরাপত্তা, মানুষের স্থিরতা, তাদের রক্ত, সম্মান ও অর্থের নিরাপত্তা এবং সমগ্র কল্যাণ। যেমনিভাবে এর থেকে বিচ্যুত হওয়ার মধ্যে রয়েছে সমগ্র অকল্যাণ।

আল্লাহ তা'আলা মাদকদ্রব্য, নেশাদ্রব্য ও অবসাদ আনায়নকারী (المفترات) বস্তুগুলোকে [৬৫] হারাম করা দ্বারা বিবেককে হিফায়ত করেছেন। তিনি মদ্যপানকারীকে মদ থেকে বিরত রাখতে, তার বিবেকের হিফায়ত এবং মানুষকে তার অনিষ্ট থেকে রক্ষা করতে হৃদ (নির্ধারিত শাস্তি) এর ব্যবস্থা করেছেন। তা হচ্ছে: সে যতবারই তা করবে তাকে চল্লিশ থেকে আশিটি চাবুকাঘাত করা হবে।

আল্লাহ তা'আলা কিসাসের মাধ্যমে অন্যায়ভাবে সীমালঙ্ঘনকারী থেকে মুসলিমদের হিফাজত করেছেন। ফলে হত্যাকারীকে হত্যা করা হবে। তিনি জখমের ব্যাপারেও কিসাসের বিধান দিয়েছেন, যেমনিভাবে মুসলিম ব্যক্তির আত্মরক্ষা, সম্মান এবং তার সম্পত্তি সংরক্ষণের বিধান দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة:

[179

“আর হে বুদ্ধি-বিবেকসম্পন্নগণ ! কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে জীবন, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর।” [সূরা আল-বাকারাহ: ১৭৯]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “যে ব্যক্তি তার সম্পদ রক্ষার্থে নিহত হয়, সে শহীদ। আর যে ব্যক্তি তার দীন রক্ষার্থে নিহত হয়, সে শহীদ। যে ব্যক্তি তার রক্ত (প্রাণ) রক্ষার্থে নিহত হয়, সে শহীদ। আর যে ব্যক্তি তার পরিবার রক্ষার্থে নিহত হয়, সে শহীদ।” [৬৬]

আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের সম্মান (ইজ্জত) হিফাজত করেছেন: সেটা এভাবে যে, তিনি কোন মুসলিমের অবর্তমানে তার অপছন্দনীয় কথা উল্লেখ করাকে হারাম হিসেবে বিধান আরোপ করেছেন, তবে ন্যায় সঙ্গত ব্যাপার হলে ভিন্ন কথা। এছাড়াও শরীআতের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রমাণিত নয় কোন মুসলিম ব্যক্তির ব্যাপারে চারিত্রিক এমন কোন অপবাদের জন্য হদ নির্ধারণের মাধ্যমে, যেমন: যিনা, লাওয়াতাত ইত্যাদির অপবাদ।

অবৈধ পন্থায় [৬৭] বংশধারাকে সংমিশ্রিত হওয়া থেকে আল্লাহ হিফাযত করেছেন। তিনি চারিত্রিক অপরাধের

মাধ্যমে মর্যাদা কলুষিত হওয়া থেকে হিফাযতের উদ্দেশ্যে যিনাকে বড় ধরণের অপরাধ হিসেবে গণ্য করেছেন এবং এটাকে কাবীরাহ গুনাহসমূহের মধ্যে অন্যতম গুনাহ হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। আর যিনার হদ কার্যকর হওয়ার শর্ত পূরণ হলে এটাকে ব্যভিচারীর জন্য কঠোর শাস্তির কারণ বানিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা সম্পদের হিফাযত করেছেন: আর তা চুরি, ধোঁকা, জুয়া বা বাজি ও ঘুষ ইত্যাদি হারাম অর্থ উপার্জন করা হারাম ঘোষণার মাধ্যমে। এছাড়াও তিনি চোর ও ডাকাতের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন, তা হচ্ছে: [চুরির ক্ষেত্রে] হাত ও [ডাকাতির ক্ষেত্রে] হাতের সাথে বিপরীতভাবে] পা কেটে ফেলা, যখন তাদের উপরে হদ প্রয়োগের শর্ত পূরণ হবে। আর যদি শর্ত পূরণ না হয় তবে চুরি প্রমাণিত হয়, সেক্ষেত্রে তাকে এ কাজ থেকে বিরত রাখবে এমন শাস্তির আওতায় আনার মাধ্যমে।

এ সব হদ (নির্ধারিত সাজা) এর ব্যবস্থা যিনি করেছেন, তিনি হচ্ছেন মহাজ্ঞানী প্রজ্ঞাময় আল্লাহ। তিনি তার বান্দাদেরকে সংশোধনকারী বিষয় সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো জানেন এবং তিনি তাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালুও বটে। মুসলিম অপরাধীদের অপরাধগুলোর কাফফারা হিসেবে এবং তাদের ও অন্যান্যদের অনিষ্ট হতে সমাজকে রক্ষা করার জন্য তিনি এসব হদ নির্ধারণ করেছেন। ইসলামের

শত্রু ও তাদের দোসরদের মধ্য হতে যারা হত্যাকারীকে হত্যা এবং চোরের হাত কেটে ফেলাকে দৃষণীয় মনে করে, তারা মূলত নষ্ট হয়ে যাওয়া এমন অসুস্থ অঙ্গ কেটে ফেলাকে দৃষণীয় মনে করে থাকে, যদি তা না কেটে ফেলা হয়, তাহলে তার এ ক্ষতিকর দিক গোটা সমাজকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে [৬৮]। অথচ একই সময়ে তারা তাদের অন্যায়মূলক মর্যাদা রক্ষার ক্ষেত্রে নির্দোষদের হত্যা করাকে উত্তম কাজ বলে মনে করে।

সপ্তমত: আন্তর্জাতিক রাজনীতি সংক্রান্ত বিষয়ে:

আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদেরকে এবং তাদের শাসকর্তাদেরকে আদেশ করেছেন যে, তারা অমুসলিমদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করবে; যাতে করে তারা তাদেরকে কুফুরীর অন্ধকার থেকে আল্লাহর প্রতি ঈমানের আলোতে নিয়ে আসতে পারে এবং সেই সাথে এ দুনিয়ার বস্তুগত বিষয়ের মধ্যে ডুবে থাকার দুর্ভাগ্য ও আধ্যাত্মিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ থেকে বঞ্চিত হওয়া থেকে মুক্তি দিতে পারে, যে আধ্যাত্মিক সুখ-স্বাচ্ছন্দের নি'আমাত আল্লাহ তা'আলা প্রকৃতপক্ষে মুসলিমদেরকে দিয়েছেন। সুতরাং মুসলিমের জন্য আল্লাহর এ আদেশ হলো: সে একজন প্রকৃত সং মানুষ হবে, যে তার নিজস্ব যোগ্যতা

দিয়ে মানবকুলের উপকার করবে এবং তাদের সকলের মুক্তির জন্য প্রচেষ্টা চালাবে। কিন্তু মানব রচিত জীবন-বিধান এর বিপরীত; কেননা তা শুধু একজন মানুষ থেকে ভালো নাগরিক হওয়ার দাবী জানায়। সুতরাং এটিই এ পদ্ধতির অসারতা ও ত্রুটি, আর বিপরীত দিকে ইসলামের উপযুক্ততা ও পরিপূর্ণতার প্রমাণ।

মুসলিমদেরকে আল্লাহ তা'আলা আরও আদেশ করেছেন যে, তারা যেন তাদের সাধ্যানুযায়ী আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয় করে; যেন এতে করে তারা ইসলাম ও মুসলিমদের রক্ষা করতে পারে এবং সেই সাথে তাদের শত্রু ও আল্লাহর শত্রুদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করতে পারে। ঠিক অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদের জন্য অমুসলিমদের সাথে চুক্তি সম্পাদন করাকে বৈধ করেছেন, যখন ইসলামী শরী'আতের আলোকে তাদের এমন কোন প্রয়োজন দেখা দেয়। শত্রুপক্ষ কর্তৃক তাদের চুক্তি ভঙ্গ করা অথবা এমন কোন কাজ করা যা দ্বারা চুক্তি ভঙ্গ করা আবশ্যিক হয়, আর তারা তা স্পষ্টত বুঝতে পারে ইত্যাদি অবস্থা না হলে মুসলিমদের উপরে উক্ত সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ করাকে আল্লাহ তা'আলা হারাম করেছেন।

আল্লাহ মুসলিমদেরকে এ মর্মে আদেশ করেছেন যে, অমুসলিমদের সাথে যুদ্ধ শুরু করার আগে প্রথমে তারা তাদের শত্রুদেরকে ইসলামে প্রবেশের আহ্বান জানাবে।

আর যদি তারা তা মানতে অস্বীকৃতি জানায় তখন মুসলিমরা তাদেরকে জিযিয়া প্রদান এবং আল্লাহর হুকুমকে বিনীতভাবে মেনে নেওয়ার দাবী করবো।[৬৯] যদি তারা এক্ষেত্রেও অস্বীকার করে তাহলে তাদের সাথে যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না ফিতনা [৭০] দূরীভূত হয়ে দীন (জীবন ব্যবস্থা) সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়।

শিশু, মহিলা, বয়োঃবৃদ্ধ, ইবাদাতগৃহে থাকা ধর্মীয় পণ্ডিত (পাদ্রী বা পুরোহিত) এ সকল মানুষকে হত্যা করা যুদ্ধ চলাকালীন সময়েও আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদের উপরে হারাম করেছেন। তবে যদি তারা যোদ্ধাদের সাথে সরাসরি কাজের মাধ্যমে অথবা বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়ে সম্পৃক্ত থাকে, তাহলে ভিন্ন কথা। আল্লাহ মুসলিমদেরকে আরও আদেশ করেছেন যে, তারা যেন যুদ্ধবন্দিদের সাথে উত্তম আচরণ করে। আর এতে করে আমরা বুঝতে পারি যে, ইসলামে যুদ্ধ শুধুমাত্র ক্ষমতা দখল বা আধিপত্য বিস্তারের জন্য নয়; বরং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে সত্য ও সৃষ্টির জন্য রহমত ছড়িয়ে দেওয়া এবং মানুষকে মাখলুকের দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর ইবাদাতের দিকে নিয়ে যাওয়া।

অষ্টমত: স্বাধীনতা সংক্রান্ত বিষয়ে:

(ক) আকীদার স্বাধীনতা:

ইসলামের প্রতি আহ্বান করার পরে এবং ইসলামের বিস্তারিত বর্ণনা উপস্থাপিত হওয়ার পরে অমুসলিমদের মধ্য থেকে যারা আল্লাহর হুকুমের মধ্যে প্রবেশ করতে চায়, আল্লাহ তা'আলা দীন ইসলামের মধ্যে তাদের জন্য আকীদার স্বাধীনতা প্রদান করেছেন। যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে থাকে, তবে তাতে তাদের সৌভাগ্য এবং মুক্তি রয়েছে। আর যদি তারা তাদের স্বীয় ধর্মের উপরে অবস্থান করতে চায়, তবে উক্ত ব্যক্তি তার নিজের জন্য কুফর, দুর্ভাগ্য এবং জাহান্নামের আযাবকে নির্ধারণ করে নেবে। আর এর মাধ্যমে তার উপরে প্রমাণ কায়েম সমাপ্ত হবে, আল্লাহর কাছে পেশ করার মত তার জন্য কোন ওজর থাকবে না। আর ঐ সময়ে মুসলিমরা তাকে তার বিশ্বাসের উপরেই ছেড়ে দেবে। তবে এ শর্তে যে, সে বিনীতভাবে মুসলিমদের কাছে জিযিয়া প্রদান করবে, ইসলামী হুকুমের প্রতি বিনীত থাকবে এবং তার কুফুরীর কোন নিদর্শন মুসলিমদের সামনে গর্বভরে পেশ করবে না।

কোন মুসলিম ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করার পরে রিদাহ তথা ইসলাম থেকে ফিরে যাওয়ার বিষয়টি গ্রহণ করা হবে না। যদি সে ইসলাম থেকে ফিরে যায় তবে তার শাস্তি হচ্ছে হত্যা। আর এর কারণ হচ্ছে: সত্যকে জানার পরে সে সেখান থেকে পলায়ন করেছে। আর এ কারণে সে বেঁচে থাকার অনুপযুক্ত গণ্য হবে। তবে আল্লাহর কাছে যদি তওবা

করে অথবা ইসলামের দিকে ফিরে আসে তবে ভিন্ন কথা।[৭১]

আর যদি তার রিদ্বাহটি ইসলাম বিধ্বংসী কোন কার্যক্রমের কারণে হয়ে থাকে, তাহলে সে এটাকে পরিত্যাগ করবে, ঘৃণা করবে এবং এর থেকে তাওবা করবে, আর আল্লাহর কাছে গুনাহ ক্ষমা চাইবে।

ইসলাম বিধ্বংসী কার্যক্রম অসংখ্য। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে:

আল্লাহ তা'আলার সাথে শিরক করা। শিরক হচ্ছে: কোন বান্দা কর্তৃক আল্লাহর সাথে অন্য কোন ইলাহ নির্ধারণ করা। যদিও সেটি আল্লাহ ও তার (বান্দার) মধ্যে এমন মধ্যস্থতাকারী হিসেবে মেনে নেওয়ার মাধ্যমে হয়, সে তাকে আহ্বান করবে এবং তাকে আল্লাহর নৈকট্য প্রদান করবে। হোক সে তাকে ইলাহ হিসেবে নামকরণ এবং 'ইলাহ ও ইবাদত' এর অর্থ জেনে তা স্বীকার করুক, যেমনটি জাহিলী যুগের ঐ সমস্ত মুশরিকরা করত, যারা সৎ কর্মশীল বান্দাদের প্রতীকী মূর্তি তৈরী করে তাদের কাছ থেকে সুপারিশের আশায় তাদের ইবাদাত করত। অথবা সে স্বীকার না করুক যে, সে আল্লাহর সাথে থাকা অন্য একজন ইলাহ, আর তার ইবাদাত করাই আল্লাহর ইবাদত, যেমনটি ইসলামের দিকে নিজেদেরকে সম্পৃক্তকারী কতিপয়

মুশরিকদের অবস্থা, যখন তাদেরকে তাওহীদের দিকে আহ্বান করা হয়, তখন তারা এ ধারণাতে তা গ্রহণ করে না যে, শিরক হচ্ছে শুধুমাত্র মূর্তিকে সিজদা করার নাম, অথবা বান্দা কর্তৃক আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন বস্তুকে এ কথা বলা যে, “এটা আমার ইলাহ।”

এদের উদাহরণ হচ্ছে তাদের মত, যারা মদকে অন্য নামে নামকরণ করে তা পান করে। এদের অবস্থা সম্পর্কে আগে বর্ণনা করে হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

﴿... فَأَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ۗ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ۗ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ﴾
[الزمر: 2-3]

“দীনকে নির্ভেজাল করে তুমি আল্লাহর ইবাদাত করবে। সাবধান! নির্ভেজাল দীন শুধু আল্লাহরই। তাঁকে ব্যতীত যারা অন্য কোন অভিভাবককে গ্রহণ করে, [আর বলে] আমরা তাদের ইবাদাত এ জন্যই করি, যেন তারা আমাদেরকে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে। নিশ্চয় তারা যে বিষয়ে মতবিরোধ করছে, সে ব্যাপারে আল্লাহ তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন।

নিশ্চয় আল্লাহ তাকে হিদায়াত দেন না, যে মিথ্যাবাদী অস্বীকারকারী।” [সূরা আয-যুমার: ২-৩].

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেছেন,

﴿... ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۗ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ
مِنْ قَظْمِيرٍ ﴿١٣﴾ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ ۗ
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ۗ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴿١٤﴾﴾
[ফاطر: 13-14]

“তিনিই আল্লাহ, তোমাদের রব, রাজত্ব তাঁরই। আর তোমরা আল্লাহকে ব্যতীত অন্য কাউকে ডাক, তারা [খেজুর] বীচির উপরের আবরণের মালিকও নয়। যদি তোমরা তাদেরকে আহ্বান কর, তবুও তারা তোমাদের আহ্বান শুনতে পায় না। আ যদিও শুনতে পেত, তবুও সাড়া দিত না। আর কিয়ামাতের দিনে তারা তোমাদের কৃত শিরক সম্পর্কে অস্বীকার করবে। আর তোমাকে সবকিছু সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত [আল্লাহর] ন্যায় কেউই সংবাদ দিতে পারবে না।” [সূরা ফাত্বির: ১৩-১৪]

১। মুশরিক ও অন্যান্য কাফিরদেরকে কাফির না বলা: যেমন ইহুদী, খৃষ্টান, নাস্তিক, মূর্তিপূজক, বিভিন্ন শ্রেণির তাগুত, যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফয়সালা

করে না এবং আল্লাহর হুকুমের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হয় না। তাদের আল্লাহকে অস্বীকার করার ব্যাপারে জানার পরেও যারা তাদেরকে কাফির বলে না, সেও কুফুরী করল।

২। যাদু-বড় শিরক আবশ্যিককারী। সুতরাং যে তা করবে অথবা এর কুফুরী সম্পর্কে জানা থাকার পরও সে ব্যাপারে সন্তুষ্ট হল, তাহলে সে কর্তা কাফির।

৩। ইসলাম ছাড়া অন্য কোন শরীআত বা নিয়মকে ইসলামী শরীআত উত্তম বলে বিশ্বাস করা বা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফায়সালা থেকে অন্য কারো ফায়সালাকে উত্তম বলে বিশ্বাস করা বা আল্লাহর হুকুম ব্যতীত অন্য কারো হুকুম দ্বারা বিচার ফয়সালা বৈধ বলে বিশ্বাস করা।

৪। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঘৃণা করা অথবা জেনে শুনে তার শরীআতের কোন কিছুকে ঘৃণা করা।

৫। জেনে শুনে ইসলামের কোন বিধানের সাথে ইস্তিহযা বা ঠাট্টা বিদ্রূপ করা [৭২]।

৬। ইসলামের বিজয় অপছন্দ করা অথবা ইসলামের দুঃসময়ে খুশি হওয়া।

৭। ভালোবাসা ও সাহায্য করার মাধ্যমে কাফিরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করা; অথচ এটা তার জানা যে, তাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা তাদের মধ্যেই গণ্য হবে।

৮। যে কোন বিষয় হোক না কেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরী'আত থেকে বের হওয়া সঠিক নয়, এটা জানার পরেও তা থেকে বের হওয়ার সুযোগ আছে বলে বিশ্বাস করা।

৯। আল্লাহর দীন থেকে বিচ্যুত হওয়া। সুতরাং স্মরণ করিয়ে দেওয়ার পরও যদি কেউ ইসলাম বিমুখ হয়, সে তা শিক্ষা করে না আর সে অনুযায়ী আমলও করে না, তাহলে সে কুফুরী করল।

১০। যে সম্পর্কে তার অজ্ঞতা নেই এবং ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইসলামের এমন হুকুমসমূহের মধ্য হতে কোন একটি হুকুমকে অস্বীকার করা। এ সমস্ত ইসলাম বিধবংসী কার্যক্রমের অসংখ্য দলীল কুরআন এবং সুন্নাহতে রয়েছে।

খ) মত প্রকাশের স্বাধীনতা:

ইসলামী শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক হবে না এ শর্তে আল্লাহ তা'আলা ইসলামের মধ্যে মত প্রকাশের স্বাধীনতা প্রদান করেছেন। সুতরাং তিনি কোন নিন্দুকের নিন্দাকে পরোয়া না

করে মুসলিম ব্যক্তিকে সকলের সামনেই সত্য কথা বলার আদেশ দিয়েছেন। আর এটিকে তিনি উত্তম জিহাদ হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। তাকে আরো আদেশ করেছেন, সে যেন মুসলিমদের শাসক বা রাষ্ট্রপ্রধানদেরকে নসীহত করে এবং তাদেরকে ইসলাম বিরোধী কাজ থেকে নিষেধ করে। তিনি বাতিলের দিকে আহ্বানকারীকে থামিয়ে দিতে এবং তা থেকে নিষেধ করতেও আদেশ করেছেন। মতকে সম্মান দেওয়ার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে এটি একটি অনুপম ও মহৎ পদ্ধতি। পক্ষান্তরে আল্লাহর শরীআতের বিরোধী এমন কোন মতের প্রবক্তাকে তা প্রকাশের অনুমতি দেয়নি; কারণ তা ধ্বংস, বিনষ্ট ও সত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

(গ) ব্যক্তি স্বাধীনতা:

পুতঃপবিত্র ইসলামী শরীআতের সীমার মধ্যে থেকে ইসলামে আল্লাহ তাআলা ব্যক্তিগত স্বাধীনতাও প্রদান করেছেন। সুতরাং তিনি প্রত্যেক মানুষকে, হোক সে পুরুষ অথবা নারী, তার সাথে অন্যান্যদের সম্পাদিত কার্যক্রমের মধ্যে সকলের ক্ষেত্রেই স্বাধীনতা দান করেছেন, যেমন: ক্রয়-বিক্রয়, দান করা, ওয়াকফ করা ও ক্ষমা করা ইত্যাদি। আবার তিনি প্রত্যেক পুরুষ এবং নারীকেই তার দাম্পত্য জীবনের সঙ্গী নির্বাচন করার স্বাধীনতা দিয়েছেন। সুতরাং যদি কেউ কাউকে পছন্দ না করে, তাহলে তাকে বাধ্য করা যাবে না। যদি কোন পুরুষের ক্ষেত্রে দীনের সমতা (কুফূ) না

পাওয়া যায়, তাহলে কোন নারীকে এ ব্যাপারে অনুমতি দেয়া হবে না। এটা তার আকীদা ও মর্যাদা রক্ষার্থে। সুতরাং এ নিষেধাজ্ঞা মহিলার নিজেদের এবং তার পরিবারের কল্যাণের জন্যই।

মহিলার অভিভাবক (অলী) - তার বংশের দিক থেকে সবচেয়ে নিকটতম পুরুষ অথবা তার প্রতিনিধি-, সেই বিবাহের আক্কেদের ক্ষেত্রে মহিলার দায়িত্ব নেবে। কেননা নারী তার নিজেকে বিবাহ দিতে পারে না। যেহেতু এক্ষেত্রে ব্যভিচারী নারীর সাথে সাদৃশ্য পাওয়া যায়। অলী বরকে উদ্দেশ্য করে বলবে: “আমি অমুককে আপনার সাথে বিবাহ দিলাম।” আর বর তার জবাবে বলবে: “আমি এ বিবাহকে কবুল করলাম।” আর আক্কেদের সময়ে দুজন সাক্ষী উপস্থিত থাকতে হয়।

মুসলিম ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তা'আলা যে শরী'আত নির্ধারণ করেছেন, উক্ত সীমারেখা অতিক্রম করার অনুমতি ইসলাম দেয়নি। যেহেতু সে এবং তার অধিনস্ত সকলেই আল্লাহর মালিকানাধীন। সুতরাং তার জন্য ফরয হচ্ছে যে, তার সকল কর্মকাণ্ড হতে হবে আল্লাহর শরী'আতের সীমার মধ্যে থেকে, যে শরী'আতকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের জন্য রহমত স্বরূপ নির্ধারণ করেছেন। যে উক্ত শরী'আতকে আঁকড়ে ধরবে, সে হিদায়াত পাবে আর সৌভাগ্যবান হবে। আর যে তার বিরোধিতা করবে, সে ধ্বংস

হবে ও দুর্দশায় নিমজ্জিত হবে। আর এ কারণে আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত কঠোরভাবে যিনা এবং সমকামিতাকে হারাম করেছেন। এছাড়াও মুসলিমের জন্য আত্মহত্যা করা এবং আল্লাহ তাকে যে অবয়বে সৃষ্টি করেছেন সে সৃষ্টিকে পরিবর্তনকে হারাম করেছেন।

আর গোঁফ ছোট করা, নখ কেটে ফেলা, নাভির নিচের লোম ও বগলের চুল পরিষ্কার করা এবং খাতনা করা ইত্যাদির ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা আদেশ করেছেন।

আল্লাহর শত্রুদের সাথে তাদের বৈশিষ্ট্য বহনকারী বিষয়ে সাদৃশ্য রাখা আল্লাহ তা'আলা মুসলিমের জন্য হারাম করেছেন। কেননা তাদেরকে বাহ্যিকভাবে ভালোবাসা ও তাদের সাথে বাহ্যিক ব্যাপারে সাদৃশ্য রাখা তাদের সাথে অন্তরের দিক থেকে ভালোবাসা ও সাদৃশ্য রাখার দিকে ধাবিত করে।

আল্লাহ তা'আলা মুসলিম ব্যক্তির কাছ থেকে চান যে, সে যেন ইসলামী সঠিক চিন্তাধারার অধিকারী বা উৎসে পরিণত হয়। অন্য মানুষের চিন্তা চেতনার আমদানীকারক না হয়। আল্লাহ তা'আলা মুসলিমের জন্য চান যে, সে উত্তম আদর্শবান হোক, কোন গতানুগতিক অন্ধ অনুসারী না হোক।

আর যা কারিগরী বিদ্যা, ও সুষ্ঠু প্রকৌশল দক্ষতা সংক্রান্ত ব্যাপার, তা গ্রহণ করা ও শিক্ষার ব্যাপারে ইসলাম আদেশ করেছে। যদিও এক্ষেত্রে অমুসলিমরা [শিক্ষাদানে তাদের থেকে] অগ্রগামী হয়; কেননা আল্লাহ তা'আলাই মানুষের প্রকৃত শিক্ষক। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ [العلق: 5]

“শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।” [সূরা আল-আলাক্ব: ০৫]

আর মানুষের নিজস্ব স্বাধীনতা হতে উপকার গ্রহণ এবং তার নিজের ও অন্যান্যদের অনিষ্ট হতে তার সম্মান-মর্যাদা রক্ষা ও তা সংরক্ষণ করার ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে মানুষের জন্য সর্বোত্তম পর্যায়ের নসীহত এবং সংশোধনের উপায়।

(ঘ) বাসস্থানের স্বাধীনতা:

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে বাসস্থানের স্বাধীনতা প্রদান করেছেন। সুতরাং কোন ব্যক্তির জন্য কারো বাড়িতে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করা বৈধ নয়। আবার তার অনুমতি ব্যতীত তার বাড়ির অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করাও বৈধ নয়।

(ঙ) উপার্জনের স্বাধীনতা:

মুসলিম ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য নির্ধারিত শরী'আতের মধ্যে থেকে অর্থ উপার্জন ও তা ব্যয় করার স্বাধীনতা প্রদান করেছেন। সুতরাং আল্লাহ তাকে আদেশ করেছেন কাজ করতে এবং অর্থ উপার্জন করতে; যাতে সে তার নিজের এবং তার পরিবারের জন্য যথেষ্ট হতে পারে এবং সে সাওয়াবের কাজ ও ইহসান (পরোপকার) এর ক্ষেত্রে ব্যয় করতে পারে। একই সময়ে আল্লাহ হারাম উপার্জনকে তার উপরে হারাম করেছেন, যেমন: সুদ, জুয়া, ঘুষ, চুরি, গণকের মজুরী, যাদু, যিনা ও সমকামিতার মাধ্যমে উপার্জন করা। আল্লাহ তা'আলা আরও হারাম করেছেন হারাম বস্তুসমূহের মূল্যকে, যেমন: কোন প্রাণবিশিষ্ট জন্তুর ছবি [৭৩], মদ, শুকর, হারাম খেলা বা বিনোদন সামগ্রী অথবা নাচ-গানের মজুরী ইত্যাদি। যেভাবে এসব উৎস থেকে উপার্জন করা হারাম, তেমনভাবে এসব ক্ষেত্রে ব্যয় করাও হারাম। সুতরাং কোন মুসলিমের জন্য শরী'আত নির্দেশিত পন্থা ছাড়া ব্যয় করা বৈধ নয়। আর এটি হচ্ছে আয়-ব্যয়ের ক্ষেত্রে মানুষের জন্য সর্বোত্তম পর্যায়ের নসীহত, হিদায়াত এবং সংশোধনের পন্থা। যাতে করে সে হালাল উপার্জনের মাধ্যমে ধনী হওয়ার পাশাপাশি সুখী হয়ে বাঁচতে পারে।

নবমত: পরিবার সংক্রান্ত বিষয়ে:

আল্লাহ তা'আলা ইসলামী শরী'আতে পরিবারের ব্যাপারে পূর্ণাঙ্গ একটি জীবন বিধানের ব্যবস্থা প্রণয়ন করেছেন। যারা

এটিকে গ্রহণ করবে তাদের সৌভাগ্যের উপকরণসমূহ বাস্তবায়িত হবে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা পিতামাতার সাথে উত্তম আচরণকে বিধিবদ্ধ করেছেন, তা হবে: উত্তম কথা, দূরে অবস্থান করলে বারবার তাদেরকে দেখতে যাওয়া, তাদের উভয়ের খিদমাত করা, তাদের প্রয়োজন মেটানো, তাদের জন্য ব্যয় করা, তাদের কেউ অথবা উভয়েই দরিদ্র হলে তাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে। যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতার ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করবে তার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা কঠোর আযাবের কথা ঘোষণা করেছেন। আর তাদের প্রতি উত্তম আচরণকারীকে সৌভাগ্যের ওয়াদা করেছেন। এছাড়াও আল্লাহ তা'আলা বিবাহকে বিধিবদ্ধ করেছেন এবং এর শরী'আতসম্মত হওয়ার বিষয়টি তাঁর কিতাবে এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষাতে উল্লেখ করেছেন।

বিবাহ শরী'আতসম্মত হওয়ার হিকমাত:

১। বিবাহের মাধ্যমে চারিত্রিক পবিত্রতা, হারাম (যিনা) থেকে যৌনাঙ্গকে হিফায়ত করা এবং হারামের প্রতি দৃষ্টিপাত থেকে চোখকে হিফায়ত করা ইত্যাদি অর্জিত হয়।

২। স্বামী-স্ত্রীর একে অপর থেকে আত্মিক প্রশান্তি ও স্থিরতা লাভ হয়। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা তাদের মধ্যে ভালোবাসা ও রহমত সৃষ্টি করেছেন।

৩। বিবাহের মাধ্যমে মুসলিমদের সংখ্যা শরী'আতসম্মতভাবে বৃদ্ধি পায়। এতে কল্যাণ ও পবিত্রতা নিহিত রয়েছে।

৪। বিবাহের মাধ্যমে স্বামীর ও স্ত্রীর প্রত্যেকে তার দায়িত্ব থেকে অপরকে এমন সেবা করতে পারে, যে কাজ তাদের উভয়ের জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা প্রকৃতিগতভাবে সামঞ্জস্যশীল করেছেন।

সুতরাং পুরুষ বাড়ির বাইরে কাজ করবে এবং সম্পদ বা অর্থ উপার্জন করবে, যাতে করে সে তার স্ত্রী ও সন্তানদের জন্য খরচ করতে পারে। অপরদিকে স্ত্রী বাড়ির অভ্যন্তরে কাজ করবে, সন্তান ধারণ করবে, দুধ পান করাবে, বাচ্চাদের লালন-পালন করবে, স্বামীর জন্য খাদ্য প্রস্তুত করবে, বাড়ি-ঘর ও বিছানা সাজাবে ইত্যাদি। যখন স্বামী ক্লান্ত হয়ে বাসায় প্রবেশ করবে তখন তার থেকে ক্লান্তি ও চিন্তা-ভাবনা দূরীভূত হবে, আর সে তার স্ত্রী ও সন্তানদের সাথে অন্তরঙ্গ সময় কাটাবে। আর এভাবেই সকলে প্রশান্তি ও আনন্দময় জীবন যাপন করবে। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে সম্মত হলে, কোন কোন ক্ষেত্রে আর্থিক কর্মকাণ্ডে স্ত্রী তার স্বীয় স্বামীর পাশে

দাঁড়ানোতে কোন বাধা নেই। তবে এতে শর্ত হলো যে কাজ করবে তা পুরুষ হতে আলাদা হতে হবে যাতে উভয়ের সংমিশ্রণ না হয়। হতে পারে তা নিজ গৃহে বা তার স্বামীর কিংবা নিজ পরিবারের ক্ষেত্রে-খামারে। অপরদিকে কল-কারখানা, অফিস, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা অনুরূপ প্রতিষ্ঠান, যাতে নারীরা পুরুষদের সাথে মিলেমিশে কাজ করে, এমন স্থানে নারীর জন্য কাজ করা বৈধ নয়। স্বামীর জন্য, তার পিতামাতার জন্য অথবা নিকটাত্মীয়দের জন্যও জায়িয নেই যে, তারা এটাকে অনুমোদন দেবে; যদিও স্ত্রী এক্ষেত্রে রাজি হয়ে যায়। কারণ এটি তাকে এবং সমাজকে ধংসের দিকে ঠেলে দেওয়ার শামিল। স্ত্রী যতক্ষণ পুরুষদের সামনে না যেয়ে তার বাড়িতে সংরক্ষিত ও নিরাপদ থাকে ততক্ষণ সে নিরাপত্তার মধ্যে থাকে, কোন পাপীর হাত তার দিকে প্রসারিত হয় না, কোন খিয়ানতকারীর চোখ তার দিকে তাকায় না। আর যখন সে মানুষের মধ্যে বের হয়, তখন সে হারিয়ে যায় এবং অসংখ্য বাঘের মধ্যে বকরীর ন্যায় অবস্থাতে পড়ে যায়। কখনো কখনো সামান্য কিছু সময় যেতে না যেতেই ঐ সমস্ত খারাপ লোকেরা তার সম্মান ও মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করে দেয়। আর স্বামীর জন্য যদি একজন স্ত্রী যথেষ্ট না হয়, তাহলে আল্লাহ চারটি পর্যন্ত বিবাহ করার অনুমতি দিয়েছেন। তবে এ শর্তে যে, তার সামর্থ অনুযায়ী তাদের মধ্যে বাসস্থান, ব্যয় ও রাত্রি যাপনে সমতা

বজায় রাখবে। তবে অন্তরের ভালোবাসার দিক থেকে সমতা বজায় রাখা শর্ত নয়; কেননা এটি এমন একটি বিষয় যাতে মানুষের হাত নেই এবং তাকে তিরস্কারও করা যায় না। আর এ প্রকারের সমতা বিধানের ক্ষেত্রে যে ব্যাপারটি আল্লাহ তাঁর নিজের ভাষায় নাকচ করে দিয়েছেন:

﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ...﴾ [النساء: 129]

“আর তোমরা চাইলেও কখনোই নারীদের মধ্যে সমতা বজায় রাখতে পারবে না।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১২৯]

তা হচ্ছে: ভালোবাসা ও এর সাথে সংযুক্ত বিষয়, এটা এমন সমতা (আদল) যার বাস্তবায়ন না হওয়ার কারণে আল্লাহ একাধিক বিবাহকে নিষেধ করেননি। কেননা মানুষ এতে অপারগ। আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলদের জন্য এবং যারা সামর্থের মধ্যে থাকা সমতা রাখতে পারে এমন ব্যক্তিদের জন্য বিবাহকে বৈধ করেছেন। কেননা আল্লাহ সুবহানাল্ ওয়া তা'আলা তাদের জন্য কল্যাণকর বিষয়সমূহের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি জ্ঞাত। আর তা [পুরুষের একাধিক বিবাহ] পুরুষ ও নারী সবার জন্যই উত্তম। কেননা একজন সুস্থ পুরুষের দৈহিক সামর্থের দিক থেকে সে চারজন নারীর দৈহিক প্রয়োজন মেটাতে পারে এবং তাদেরকে সচ্চরিত্রবান রাখতে পারে। সুতরাং যদি একটি মাত্র স্ত্রীতে

তাকে বেঁধে দেওয়া হয়, যেমন নাসারা [৭৪] ও অন্যান্যদের বর্তমান অবস্থা এবং ইসলামের কতিপয় মিথ্যা দাবীদারেরা যে মতবাদের দিকে আহ্বান করছে। যদি সেরকম করে একটি স্ত্রীতেই সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়, তাহলে নিম্নোক্ত ধ্বংসাত্মক বিষয়গুলি দেখা দিবে:

প্রথমত: যদি স্বামী আল্লাহকে ভয় করে আর তাঁর প্রতি অনুগত মুমিন বান্দা হয়ে থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে কখনো কখনো সে তার জীবনে বঞ্চিত হওয়ার অনুভূতি নিয়ে জীবন যাপন করবে। তার নফসের হালাল প্রয়োজনকে দাবিয়ে রাখবে। যেহেতু গর্ভ ধারণের শেষ কয়েকটি মাস, নিফাস ও হায়িষের সময় এবং অসুস্থতার সময়ে স্বামী কর্তৃক একজন স্ত্রীকে যৌন উপভোগ থেকে নিষেধ করে থাকে। সুতরাং এক্ষেত্রে স্বামী তার জীবনের একটি অংশ স্ত্রী ছাড়াই কাটাতে বাধ্য হয়। এটা ঐ সময়ের কথা, যখন স্ত্রী স্বামীর কাছে পছন্দনীয় হয় এবং স্ত্রী স্বামীকে আর স্বামী স্ত্রীকে ভালোবাসে। আর যদি স্ত্রী তার কাছে পছন্দনীয় না হয়ে থাকে, তাহলে ব্যাপারটি এর থেকে আরো মারাত্মক ক্ষতিকর।

দ্বিতীয়ত: আর যদি স্বামী আল্লাহর অবাধ্য ও খিয়ানতকারী হয়ে থাকে, তাহলে স্ত্রীকে রেখে সে যিনার অশ্লীলতায় মগ্ন হয়ে পড়বে। অসংখ্য মানুষ যারা [চারজনে সীমিত] একাধিক বিবাহকে মেনে নেয় না, তারাই সীমা ছাড়া অসংখ্য

নারীর প্রতি খিয়ানত ও যিনার অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। এর চেয়ে আরও বড় অপরাধ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা বৈধ করেছেন, একথা জানার পরেও যখন সে শরী'আতসম্মত একাধিক বিবাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকে এবং তাতে দোষ খুঁজে বেড়ায়, তখন তার উপরে কুফুরীর হুকুম প্রযোজ্য হয়।

তৃতীয়ত: যদি একাধিক বিবাহকে নিষেধ করা হয়, তাহলে অসংখ্য নারী স্বামী ও সন্তান থেকে বঞ্চিত হবে। যার ফলে তাদের মধ্য হতে নেক-সচ্চরিত্রবান নারীরা অবিবাহিত, মিসকীন ও বঞ্চিত অবস্থায় জীবন যাপন করবে। অপরপক্ষে অসতী-পাপাচারী নারীদের সম্মান নিয়ে পাপিষ্ঠরা খেলায় লিপ্ত হবে।

জ্ঞাতব্য যে, পৃথিবীতে নারীদের সংখ্যা পুরুষদের তুলনায় বেশী। এর কারণ পুরুষের মৃত্যুর হার বেশি, যুদ্ধ ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজে পুরুষরা বেশি অংশগ্রহণ করে। অনুরূপভাবে এটাও জ্ঞাতব্য যে, বালিগাহ (সাবালিকা) হওয়ার পর থেকেই নারী বিবাহের প্রস্তুতি নেয়; কিন্তু পুরুষরা সকলে প্রস্তুত হতে পারে না; যেহেতু তাদের অনেকেই তাদের মোহর ও দাম্পত্য জীবনের ব্যয়ভার বহনে সক্ষমতা না থাকার কারণে বিবাহ করতে পারে না। এর মাধ্যমে জানা গেল যে, ইসলাম মহিলাদের প্রতি ইনসাফ ও রহম করেছে। আর যারা শরী'আতসম্মত একাধিক বিবাহের বিরোধিতা করে, তারা

প্রকৃতপক্ষে নারী, জ্ঞানী-গুণি ও নবীদের শত্রু। একাধিক বিবাহ করা নবী আলাইহিমুস সালামের সুন্নাত। যেহেতু তারা একাধিক বিবাহ করতেন এবং তাদেরকে আল্লাহ কর্তৃক তাদের জন্য শরীআতের ছায়াতলে তাদের একত্রিত করতেন।

আর স্বামী দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণে প্রথম স্ত্রী যে হিংসা ও চিন্তা অনুভব করে, তা আবেগজনিত কারণে হয়ে থাকে। শরীআতের দৃষ্টিতে কোন আবেগকে প্রাধান্য দেয়া সঠিক নয়। তবে স্ত্রী বিবাহের আকদের আগে তার নিজের জন্য এ শর্ত স্বামীর উপরে আরোপ করতে পারবে যে, সে তার বর্তমানে অন্য কোন নারীকে বিবাহ করতে পারবে না। যদি স্বামী তা গ্রহণ করে থাকে, তাহলে উক্ত শর্ত পালন করা আবশ্যিক হবে। তারপরে যদি স্বামী তার বর্তমানেই বিবাহ সম্পাদন করে, তখন উক্ত স্ত্রীর জন্য বিবাহ সম্পর্ক বহাল রাখা অথবা তা ভেঙ্গে দেওয়ার অধিকার থাকবে। এক্ষেত্রে স্বামী তার প্রদেয় মোহর থেকে কোন কিছুই ফেরত নিতে পারবে না।

এছাড়াও আল্লাহ তাআলা তালাককে বৈধ করেছেন। বিশেষভাবে যখন স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ ও ভাঙনের সৃষ্টি হয় এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্য হতে একজন অপরজনকে ভালোবাসতে পারে না। যাতে তাদের উভয়কেই দুদর্শা ও মতবিরোধের মধ্যে বসবাস করতে না হয় এবং যাতে করে

তাদের প্রত্যেকেই তাদের সন্তুষ্টি অনুযায়ী জোড়া খুঁজে নিতে পারে। ফলে দুনিয়ার বাকী জীবন এবং ইসলামের উপরে তাদের উভয়ে মারা গেলে আখিরাতেও [৭৫] তারা এর মাধ্যমে সৌভাগ্যবান হতে পারে।

দশমত: স্বাস্থ্য বিষয়ক:

ইসলামী শরী'আতে চিকিৎসার সকল মৌলিক বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে। কুরআনে এবং রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে শারীরিক ও মানসিক রোগসমূহের অসংখ্য বিবরণ রয়েছে এবং তাতে তার বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক উভয় চিকিৎসার বর্ণনা রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا

حَسْرًا﴾ [الإسراء: 82]

“আর আমরা নাযিল করি কুরআন, যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত।” [সূরা আল-ইসরা: ৮২].

রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “আল্লাহ এমন কোন রোগ পাঠাননি, যার জন্য তিনি আরোগ্য বিধান নাযিল করেননি। যে সেটা জানতে

পেরেছে, সে জানতে পেরেছে, আর যে সেটা জানতে পারেনি, সে অজ্ঞতার মধ্যে থেকেছে।” [৭৬]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ কর; তবে হারাম বস্তুর মাধ্যমে চিকিৎসা গ্রহণ করবে না।” [৭৭] আল্লামা ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহর “যাদুল মা’আদ ফী হাদ্ই খইরিল ‘ইবাদ” গ্রন্থে এর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। কিতাবটি পড়া যেতে পারে। কারণ ইসলামকে বর্ণনা ও সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন-চরিত আলোচনার ক্ষেত্রে এটি ইসলামী গ্রন্থগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি উপকারী, ব্যাপকতর ও বিশুদ্ধ।

একাদশ: অর্থনীতি, ব্যবসা, কল-কারখানা ও কৃষিকাজ সংক্রান্ত বিষয়: খাদ্য, পানি, জনসেবামূলক কর্মকাণ্ড, এমন সংস্থা যারা তাদের শহর ও গ্রামসমূহের প্রতিরক্ষা, সেগুলোকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, সেখানে যাতায়াত ব্যবস্থাপনা, মিথ্যা ও প্রতারণামূলক বিষয়কে প্রতিহত করাসহ ইত্যাদির জন্য কাজ করে থাকে, এগুলোর প্রতিটি ব্যাপারেই ইসলামে পরিপূর্ণ দিক-নির্দেশনামূলক বর্ণনা রয়েছে।

দ্বাদশ: গুপ্ত শত্রু ও তাদের থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার উপায় সংক্রান্ত বিষয়াদি: আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা কুরআনে

কারীমে তাঁর মুসলিম বান্দার উদ্দেশ্যে বর্ণনা করেছেন যে, তার অসংখ্য শত্রু রয়েছে। যারা তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে যাবে, যখন সে তাদের অনুগত হবে এবং তাদের বশ্যতা স্বীকার করবে। আর তাই আল্লাহ তা'আলা তাকে তাদের থেকে সতর্ক করেছেন। তিনি তাদের থেকে নিষ্কৃতির উপায়ও বর্ণনা করেছেন। এ সমস্ত শত্রুরা হচ্ছে:

প্রথম শত্রু: অভিশপ্ত শয়তান: এ শত্রু অন্যান্য শত্রুদেরকে মানুষের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয় এবং তাদেরকে মানুষের বিরুদ্ধে উদ্দীপিত করে। এ শয়তান আমাদের পিতা আদম ও আমাদের মাতা হাওয়া আলাইহিমা স সালামের শত্রু। সে তাদেরকে জান্নাত থেকে বের করেছে। দুনিয়ার শেষদিন পর্যন্ত সে আদম সন্তানের চিরস্থায়ী শত্রু। আদম সন্তানকে আল্লাহর সাথে কুফুরীতে লিপ্ত করার জন্য সে চরম প্রচেষ্টা করে চলেছে, যাতে তাদেরকে তার সাথে চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামী করে দেয় -আল্লাহর আশ্রয় চাই-। আর যাকে সে কুফুরীতে লিপ্ত করতে পারে না তাকে এমন সব গুনাহে নিমজ্জিত করার জন্য কাজ চালায়, যে গুনাহ তাকে আল্লাহর রাগ ও আযাবের সম্মুখীন করে দেয়।

শয়তান হচ্ছে এমন এক আত্মা, যে মানুষের রক্ত প্রবাহের স্থান (শিরা-উপশিরা) দিয়ে চলাচল করতে পারে। সে মানুষের অন্তরে ওয়াসওয়াসা দেয়। সে মানুষের কাছে

খারাপ কাজকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে উপস্থাপন করে থাকে, যাতে মানুষ তার অনুসরণ করে তাতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এ শয়তান থেকে বাঁচার উপায় হচ্ছে- আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যেভাবে বলেছেন যে, মুসলিম যখন রাগান্বিত হবে অথবা কোন পাপকাজে লিপ্ত হওয়ার চিন্তা জাগ্রত হবে, তখন সে বলবে: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم যার অর্থ: “আমি আল্লাহর কাছে বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।” আর তাতে তার রাগ কাজ করবে না এবং সে পাপের দিকেও আর অগ্রসর হবে না। আর সে জেনে রাখবে যে, তার অন্তরে উদিত হওয়া মন্দকাজের দিকে ধাবিতকারী বস্তু শয়তানের পক্ষ থেকেই আগত। যাতে সে তাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিতে পারে, এরপরে সে তার কাছে থেকে পৃথক হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ

أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ [فاطر: 6]

“নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শত্রু; কাজেই তাকে শত্রু হিসাবেই গ্রহণ কর। সে তো তার দলবলকে ডাকে শুধু এজন্য যে, তারা যেন প্রজ্জলিত আগুনের অধিবাসী হয়।” [সূরা ফাতিহির, আয়াত: ৬]

দ্বিতীয় শত্রু: প্রবৃত্তি: এর থেকেই সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা এবং অন্য কেউ সত্য নিয়ে আসলেও তা অস্বীকার করার প্রবণতা মানুষের মধ্যে জাগ্রত হয়। এমনভাবে আল্লাহ তা'আলার হুকুমও অস্বীকার করা ও প্রত্যাখ্যান করার প্রবণতাও দেখা যায়। যেহেতু এটা তার প্রবৃত্তির চাহিদার বিপরীত। প্রবৃত্তির মধ্যে রয়েছে আবেগকে সত্য ও ন্যায়ের উপরে প্রাধান্য দেওয়া। এ শত্রু থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার উপায় হচ্ছে: বান্দা আল্লাহ তা'আলার কাছে তার নিজস্ব প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে এবং সে প্রবৃত্তিকে উত্তেজিতকারী বিষয়ের অনুসরণ করবে না। বরং সে সত্য কথা বলবে এবং তা গ্রহণ করবে; যদিও তা তিক্ত হয়। আর আল্লাহর কাছে শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে।

তৃতীয় শত্রু: নসফে আশ্মারহ তথা অধিকহারে মন্দকাজের আদেশ দেয় এমন নাফস: এর মন্দকাজের আদেশের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, মানুষের অন্তরের হারাম বাসনা চরিতার্থ করা। যেমন: যিনা, মদ্যপান, কোন শরী'আত স্বীকৃত ওজর ব্যতীত রমাদানের সিয়াম ভঙ্গ করা এবং আরো অন্যান্য বিষয়সমূহ যা আল্লাহ তা'আলা হারাম করেছেন। এ শত্রু থেকে নিষ্কৃতির উপায় হচ্ছে: আল্লাহ তা'আলার কাছে তার নিজের নাফসের অকল্যাণ এবং শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে এবং এ ধরনের হারাম মনোবৃত্তি চরিতার্থ করার থেকে ধৈর্য ধারণ করবে। আল্লাহর

সন্তুষ্টির আশায় তা থেকে বেঁচে থাকবে। অনুরূপভাবে সে নিজেকে তার চাহিদা মোতাবেক পানাহার থেকে বিরত রেখে ধৈর্য ধারণ করাবে; যদি সেগুলো খেলে বা পান করলে তার ক্ষতি হয়। এছাড়াও সে মনে মনে স্মরণ করতে থাকবে যে, এ হারাম মনোবৃত্তি অতিদ্রুতই বিলুপ্ত হয়ে যায় আর পিছনে শুধু লজ্জা আর দীর্ঘ অনুতাপ রেখে যায়।

চতুর্থ শত্রু: মানব শয়তানসমূহ: তারা হচ্ছে বনী আদমের পাপিষ্ঠ ব্যক্তির, যাদের নিয়ে শয়তান খেলা করে থাকে। তারা মন্দ করতে থাকে, আর তাদের সাথে উঠাবসা করে এমন লোকদের সামনে তা সুন্দরভাবে পেশ করে। এ শত্রু থেকে নিষ্কৃতির উপায় হচ্ছে: এর থেকে সতর্ক থাকা, দূরে অবস্থান করা এবং তার সাথে উঠাবসা না করা।

ত্রয়োদশ: মহৎ উদ্দেশ্য ও সুখী জীবন সংক্রান্ত বিষয়ে: আল্লাহ সুবহানাল্ ওয়া তা'আলা যে মহৎ উদ্দেশ্যের প্রতি বান্দাকে অভিমুখী করেছেন, তা এ দুনিয়া এবং এতে নশ্বর প্রলুদ্ধকারী যা কিছু রয়েছে তা নয়। বরং তা হচ্ছে প্রকৃত ও চিরন্তন ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা। আর তা হচ্ছে: মৃত্যুর পরের আখিরাতের জীবন। সুতরাং প্রকৃত সত্যবাদী মুসলিম মাত্রই এ দুনিয়াকে আখিরাতের মাধ্যম ও ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করে কাজ করবে, এ জীবনকে মৌলিক উদ্দেশ্য জ্ঞান করবে না।

সুতরাং সে আল্লাহর বাণী স্মরণ করতে থাকবে:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: 56]

“আর আমি সৃষ্টি করেছি জিন এবং মানুষকে এ জন্যেই যে, তারা কেবল আমার ইবাদাত করবে।” [সূরা আয-যারিয়াত : ৫৬]

আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٩﴾ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٢٠﴾﴾ [الحشر: 18-20]

“হে ঈমানদারগণ ! তোমরা আল্লাহর তাকওয়া (ভয় বা সচেতনতা) অবলম্বন কর; এবং প্রত্যেকের উচিত চিন্তা করে দেখা আগামী কালের জন্য সে কী অগ্রিম পাঠিয়েছে। আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর; তোমরা যা কর নিশ্চয় আল্লাহ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। আর তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে; ফলে আল্লাহ তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করেছেন। তারাই হচ্ছে ফাসিক।

জাহান্নামের অধিবাসী এবং জান্নাতের অধিবাসীরা সমান নয়। জান্নাতবাসীরাই হচ্ছে সফলকাম।” [সূরা আল-হাশর: ১৮-২০]

আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾﴾

[الزلزلة: 7-8]

“কেউ অণু পরিমাণ সৎকাজ করলে সে তা দেখতে পাবে। আর কেউ অণু পরিমাণ অসৎকাজ করলে সে তাও দেখতে পাবে।” [সূরা আয-যালযালাহ ৭-৮]

আর প্রকৃত মুসলিম এ সমস্ত আয়াতগুলি এবং এর অনুরূপ অর্থবিশিষ্ট আল্লাহ তা‘আলার বাণীগুলি স্মরণ করতে থাকবে, যা দ্বারা আল্লাহ তা‘আলা তাঁর বান্দাদেরকে তিনি যে উদ্দেশ্যে তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং যে সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ তাদের জন্য অপেক্ষা করছে সেগুলোর প্রতি উৎসাহিত করে। সুতরাং সেই চিরস্থায়ী প্রকৃত ভবিষ্যতের জন্য আল্লাহ তা‘আলার এককভাবে ইখলাস সহকারে ইবাদতের মাধ্যমে সে প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় এমন আমল করবে যা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে এবং এ আশায় যে, তাকে আল্লাহ এই দুনিয়াতে সম্মানিত করবেন তাঁর আনুগত্যের

মাধ্যমে এবং মৃত্যুর পরে সম্মানিত স্থানে উপনীত করার মাধ্যমে সম্মানিত করবেন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা এই দুনিয়াতে তাকে সম্মানিত করবেন এভাবে যে, তিনি তাকে উত্তম হায়াত দান করবেন। ফলে সে আল্লাহর অভিভাবকত্ব ও হিফাযতে জীবন যাপন করবে, আর আল্লাহর নূর দ্বারা সে প্রত্যক্ষ করবে ... এবং সে সমস্ত ইবাদতগুলো সে সম্পাদন করবে, যার আদেশ আল্লাহ তা'আলা তাকে দিয়েছেন। আর আল্লাহ তা'আলার সাথে মুনাজাতে কথা বলার মাধ্যমে সে এতে স্বাদ অনুভব করতে থাকবে এবং আল্লাহ তা'আলাকে তার অন্তরে ও তার জিহ্বা দ্বারা স্মরণ করতে থাকবে, ফলে তার অন্তর প্রশান্ত হয়ে যাবে।

আর সে মানুষের প্রতি তার কথা এবং কাজ দ্বারা উত্তম আচরণ করতে থাকবে। সম্মানিত মানুষদের থেকে সে তার উত্তম কাজের স্বীকৃতি এবং তার জন্য দু'আ শুনতে পায়, যা তাকে আনন্দিত করে এবং তার বুককে প্রসারিত করে। সে আরো প্রত্যক্ষ করে যে, তিরস্কারকারী হিংসুকরা তার উত্তম কাজের অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করছে। তবুও এটা তাকে তাদের প্রতি উত্তম আচরণে বাঁধা প্রদান করে না; কেননা সে তো এটা আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং সাওয়াবের উদ্দেশ্য নিয়েই করে থাকে। ইসলাম এবং মুসলিমদের নিকৃষ্ট শত্রুরা কষ্ট দিচ্ছে এবং ঠাট্টা বিদ্রূপ করছে, সে এগুলো শুনতে পায় এবং দেখতে পায়, যা তাকে আল্লাহর রাসূলদের কথা স্মরণ

করিয়ে দেয়। আর সে এটা জানে যে, এগুলো হচ্ছে আল্লাহর রাস্তায় (থাকার দুনিয়াবী ফল)। সুতরাং তার ইসলামের প্রতি ভালোবাসা আরো বেড়ে যায় এবং সে এ পথে আরো সুদৃঢ় থাকে। সে তার নিজ হাতে অফিসে, ক্ষেত-খামারে, কল-কারখানায় এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের স্থানে কাজ করতে থাকে; যেন ইসলাম এবং মুসলিমগণ তার উৎপাদন থেকে উপকৃত হতে পারে। আর সে আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাতের দিন যেন তার ইখলাস এবং তার সৎ নিয়তের কারণে আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করতে পারে। এর সাথে সে যেন এমন উত্তম উপার্জন করতে পারে, যার দ্বারা সে তার নিজের এবং পরিবারের লোকদের ব্যয় বহন করতে পারে এবং তা থেকে দান-সদকাও করতে পারে। সুতরাং তখন সে অন্তরের দিক থেকে ধনাঢ্য, সম্মানিত এবং অল্পে তুষ্ট ব্যক্তি হিসেবে জীবন যাপন করতে থাকে। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে তার পুরস্কার আশা করতে থাকে। কেননা আল্লাহ তা'আলা শক্তি সামর্থ্যবান পেশাদার মুমিনকে ভালোবাসেন। সে কোন ধরনের অপচয় ছাড়া খাদ্য গ্রহণ করে, পান করে এবং ঘুমায়; যেন আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য সম্পাদনের ব্যাপারে এর মাধ্যমে সে শক্তি অর্জন করতে পারে। সে তার স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করে, যেন সে তার নিজেকে এবং তার স্ত্রীকে আল্লাহর হারামকৃত বিষয়াদি থেকে দূরে রাখতে পারে এবং যাতে

এমন সন্তান-সন্ততি জন্ম হয়, যারা আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত করবে, জীবিত এবং মৃত অবস্থায় তার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করবে। এভাবে তার সৎ আমলগুলো স্থায়িত্ব লাভ করবে, তার মাধ্যমে মুসলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। আর এ কারণে আল্লাহ তা'আলার কাছে সে পুরস্কার লাভ করবে। সে আল্লাহ তা'আলার প্রাপ্ত প্রতিটি নিয়ামাতের উপরে শুকরিয়া আদায় করবে, সেগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করার সামর্থ অর্জন করা এবং একথার স্বীকৃতি দেওয়ার মাধ্যমে যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই এগুলো এসেছে। এর মাধ্যমে সে আল্লাহর কাছে পুরস্কার লাভ করবে। আর সে এটাও জানবে যে, বিভিন্ন ধরনের বিপদাপদ, রোগবলাই, ভয়-ভীতি এবং ক্ষুধা ইত্যাদি যা তার উপর আপতিত হয়, এগুলো হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তার জন্য পরীক্ষা। যেন আল্লাহ তা'আলা তার সবরের পরিমাণ এবং আল্লাহর তাকদীর সম্পর্কে তাঁর সন্তুষ্টির বিষয়টি দেখে নিতে পারেন -যদিও তিনি সবচেয়ে ভালো জানেন [৭৮]-। সুতরাং সকল অবস্থাতেই সে সবর করে, সন্তুষ্ট থাকে এবং আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করতে থাকে এ আশায় যে, আল্লাহ তা'আলার ঐ সাওয়াব সে প্রাপ্ত হবে, যা আল্লাহ তা'আলা ধৈর্যধারণকারীদের জন্য প্রস্তুত করেছেন। তখন তার উপরে সকল বিপদাপদ সহজ হয়ে যায় এবং সে

তা সহজেই গ্রহণ করতে পারে, যেভাবে অসুস্থ ব্যক্তি রোগ আরোগ্যের আশায় ঔষধের তিক্ততা গ্রহণ করতে পারে।

সুতরাং যখন মুসলিম ব্যক্তি এ দুনিয়াতে এ ধরনের উচ্চতর আত্মিক সত্ত্বা সহকারে যেভাবে আল্লাহ তা'আলা তাকে আদেশ করেছেন, সেভাবে জীবন যাপন করে, তখন সে সুনিশ্চিত প্রকৃত ভবিষ্যতের লক্ষ্যে কাজ করতে থাকে; যাতে করে এমন চিরস্থায়ী সৌভাগ্য লাভ করতে পারে, যে সৌভাগ্যকে দুনিয়ার কোন পঙ্কিলতা কলুষিত করতে পারে না, আবার মৃত্যুও তা বিচ্ছিন্ন করতে পারে না। সে কোন সন্দেহ ছাড়াই এ দুনিয়াতে সৌভাগ্যবান এবং মৃত্যুর পরে আখিরাতেও সে সৌভাগ্যবান হিসেবে গণ্য হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا

وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [القصاص: 83]

“এটা আখেরাতের সে আবাস, যা আমরা নির্ধারিত করি তাদের জন্য, যারা যমীনে উদ্ধত হতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না। আর শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য।” [সূরা আল-ক্বাসাস, আয়াত: ৮৩]

মহান আল্লাহ সত্যই বলেছেন, তিনি বলেছেন:

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٧٧﴾ [النحل: 97]

“মুমিন হয়ে পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ সংকাজ করবে, অবশ্যই আমরা তাকে পবিত্র জীবন দান করব। আর অবশ্যই আমরা তাদেরকে তারা যা করত তার তুলনায় শ্রেষ্ঠ প্রতিদান দেব।” [সূরা আন-নাহাল, আয়াত: ৯৭]

পূর্বের আয়াতে কারীমা এবং অনুরূপ অর্থের আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআলা জানিয়েছেন যে, তিনি নেককার পুরুষ ও নেককার নারী, যারা এ জীবনে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে আনুগত্য করবে, তাকে এ জীবনে অতিদ্রুতই উত্তম ও সৌভাগ্যের জীবন তাদেরকে পুরস্কার হিসেবে দিবেন, যার বর্ণনা আমরা ইতোমধ্যে করেছি। আর বিলম্বের পুরস্কার তো মৃত্যুর পরে রয়েছেই, তা হচ্ছে: জান্নাতের চিরস্থায়ী নিয়ামাত। আর এ ব্যাপারেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “মুমিনের কাজের জন্য আশ্চর্য! অবশ্যই তার সকল কাজই তার জন্য কল্যাণময়। আর এটি মুমিন ছাড়া অন্য কারো জন্য হতে পারে না। যদি তার কোন আনন্দ আসে, তবে সে শুকরিয়া আদায় করে, যা তার জন্য কল্যাণময়।

আর যদি তার উপরে কোন দুঃখজনক কিছু আপতিত হয়, তাহলে সে সবর করে, সেটাও তার জন্য কল্যাণকর হয়।” [৭৯]

এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, শুধুমাত্র ইসলামেই রয়েছে সুষ্ঠু চিন্তাধারা, ভালো ও মন্দের সঠিক মানদণ্ড এবং ইনসাফপূর্ণ পূর্ণাঙ্গ জীবন পথ। এছাড়া অন্য সকল মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, শিক্ষা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতিসহ ইত্যাদি বিষয়ক প্রতিটি মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গি, এবং প্রতিটি ব্যবস্থা ও মানুষের তৈরীকৃত পথ-পদ্ধতি সকল কিছুই ইসলামের আলোকে সংশোধন করতে হবে, তার থেকে সাহায্য নিতে হবে, অন্যথায় যা ইসলামের বিপরীত, তার সফলতা অসম্ভব। বরং তা গ্রহণকারীদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে তা দুর্দশার উৎসে পরিণত হবে।

পঞ্চম অধ্যায়: কতিপয় সন্দেহের অপনোদন

প্রথমত: যারা ইসলামের সাথে অসদাচরণকারী: যারা ইসলামের প্রতি অসদাচরণকারী তারা সাধারণত দুই প্রকারের:

প্রথম প্রকার: এমন মানুষেরা, যারা ইসলামের দিকে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করে থাকে, নিজেকে মুসলিম দাবীদার; কিন্তু তারা তাদের কথাবার্তা ও কাজকর্মের মাধ্যমে ইসলামের বিরোধিতা করে। সুতরাং তারা এমন সব কাজকর্মে লিপ্ত হয়, যার থেকে ইসলাম সম্পূর্ণ আলাদা। এরা ইসলামকে ধারণ করে না এবং এদের কার্যক্রমকে ইসলামের দিকেও সম্পৃক্ত করা যায় না। এরা হচ্ছে:

(ক) আক্বীদা থেকে বিচ্যুত ব্যক্তিবর্গ: উদাহরণস্বরূপ যারা কবরসমূহের চারদিকে তাওয়াফ করে, কবরবাসীদের কাছ থেকে তাদের প্রয়োজন মেটানোর প্রার্থনা করে এবং তাদের ব্যাপারে উপকার ও ক্ষতির বিশ্বাস রাখে। [৮০]

(খ) যারা তাদের দীন ও চরিত্রের দিক থেকে অধঃপতিত:

ফলে তারা আল্লাহর ফরযসমূহকে পরিত্যাগ করে এবং তাঁর হারামকৃত কাজে লিপ্ত হয়। যেমন: যিনা ও মদ্যপান

ইত্যাদি। আর তারা ইসলামের শত্রুদেরকে ভালোবাসে এবং তাদের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করে।

(গ) ইসলামের সাথে যারা অসদাচরণকারী মানুষদের মধ্যে রয়েছে কতিপয় মুসলিম; কিন্তু আল্লাহর প্রতি তাদের ঈমান দুর্বল, ইসলামের শিক্ষা তাদের মধ্যে বাস্তবায়ন অসম্পূর্ণ। তারা কতিপয় ফরয ও ওয়াজিব আদায়ের ক্ষেত্রে অবহেলা করলেও সেগুলোকে পুরোপুরি পরিত্যাগ করে না। আবার কতিপয় হারাম কাজে লিপ্ত হলেও শিরকে আকবার (বড় শিরক) বা কুফরের পর্যায়ে পৌঁছে না। তারা কিছু হারাম মন্দ অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে থাকে, যা থেকে ইসলাম সম্পূর্ণ মুক্ত; বরং ইসলাম সেগুলোকে বড় গুনাহ হিসেবে অভিহিত করেছে। যেমন: মিথ্যা বলা, প্রতারণা করা, ওয়াদার ব্যতিক্রম করা এবং হিংসা করা। এরা সকলেই ইসলামের সাথে অসদাচরণ করে থাকে; কেননা ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ অমুসলিম ব্যক্তির তাদের কাজ দেখে মনে করে যে, ইসলাম এগুলো করতে তাদেরকে সুযোগ দেয়।

দ্বিতীয় প্রকার: ইসলামের সাথে অসদাচরণকারীদের মধ্যে রয়েছে এমন মানুষেরা, যারা ইসলামের শত্রু এবং হিংসুক। এদের মধ্যে অন্যতম: প্রাচ্যবিদ, ইহুদী, খৃস্টানবাদ প্রচারকারী এবং তাদের মত ইসলামের প্রতি হিংসার দৃষ্টি নিক্ষেপকারী আরো অনেকে। যাদেরকে মূলত ইসলামের পূর্ণাঙ্গতা, মহানুভবতা এবং এর দ্রুত প্রসার রাগান্বিত করে।

অথচ এর কারণ হচ্ছে- ইসলাম স্বভাবজাত দীন [৮১], যাকে শুধুমাত্র উপস্থাপনের মাধ্যমেই মানুষের প্রকৃতি তা গ্রহণ করে। মুসলিম ব্যতীত প্রতিটি অমুসলিমই এক ধরনের অস্থিরতা ও তাদের ধর্ম অথবা তাদের সম্পৃক্ত হওয়া মতবাদ সম্পর্কে অসন্তুষ্টির মধ্যে থাকে। এর কারণ হচ্ছে সেগুলো এমন সহজাত ও প্রকৃতির বিরোধী, যে সহজাত ও প্রকৃতির উপরে আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। প্রকৃত মুসলিম ব্যক্তিই তার দীন সম্পর্কে সন্তুষ্ট হয়ে জীবন যাপন করতে পারে; কারণ এটা হচ্ছে সত্য দীন, যা আল্লাহ তা'আলা বিধান হিসেবে দিয়েছেন। আর আল্লাহর শরী'আতই মানুষের স্বভাবের ও প্রকৃতির অনুকূল। সুতরাং এ কারণেই আমরা প্রতিটি ইহুদী, খৃষ্টান এবং ইসলামের বাইরে থাকা মানুষদেরকে বলি: তোমার সন্তানরা ইসলামের ফিতরাতে (স্বভাবের) উপরেই জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু তুমি এবং তাদের মা তাদেরকে মন্দ শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে তাদেরকে ইসলাম থেকে বের করে কুফরীর উপরে নিয়ে যাও। আর তা (কুফুরী) হচ্ছে ইসলাম বিরোধী দীন ও মতবাদসমূহ।

প্রাচ্যবিদ, খৃষ্টানবাদ প্রচারক উক্ত হিংসুকরা ইচ্ছাকৃতভাবে ইসলাম ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নিম্নোক্ত মিথ্যারোপসমূহ করে থাকে:

১। কখনো তার রিসালাতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার মাধ্যমে।

২। কখনো তার প্রতি ক্রটি ও দোষারোপ করার মাধ্যমে; অথচ আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সকল দোষক্রটি ও কমতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পরিপূর্ণ মানুষ; যদিও তাদের নাক এতে ধুলোয় ধুসরিত হোক।

৩। মহাপ্রজ্ঞাময় ও মহাজ্ঞানী আল্লাহ প্রদত্ত ইনসাফপূর্ণ ইসলামের কতিপয় বিধানকে তারা বিকৃতভাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে; যেন এর দ্বারা তারা মানুষকে দূরে রাখতে পারে।

কিন্তু আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তাআলা তাদের ষড়যন্ত্রকে বাতিল করে দেন; কেননা তারা হকের (সত্যের) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। অথচ হক সর্বদা বিজয়ী হয়, বিজিত হয় না। আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

﴿يُرِيدُونَ لِيُظْفِقُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۗ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿[الصّف: 8-9]

“তারা আল্লাহর নূরকে ফুৎকারে নেভাতে চায়, আর আল্লাহ, তিনি তাঁর নূরকে পূর্ণতাদানকারী, যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে। তিনিই সে সত্তা যিনি তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্যদ্বীনসহ পাঠিয়েছেন, যেন তিনি আর সব দ্বীনের উপর একে বিজয়ী করেন, যদিও

মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।” [সূরা আস-সফ, আয়াত:
৮-৯]

দ্বিতীয়ত: ইসলামের উৎসসমূহ:

হে জ্ঞানী! তুমি যদি প্রকৃতপক্ষে ইসলামকে জানতে চাও, তাহলে মহিমান্বিত আল-কুরআন ও রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহীহ হাদীসসমূহ পড়বে, যা লিপিবদ্ধ রয়েছে সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, মুয়াত্তা ইমাম মালিক, মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল, সুনানু আবী দাউদ, সুনানুন নাসায়ী, সুনানুত তিরমিযী, সুনানু ইবনি মাযাহ এবং সুনানুদ দারিমী ইত্যাদি গ্রন্থাবলীতে। তুমি আরও যে গ্রন্থগুলো পড়বে: ইবনু হিশামের ‘আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ’, আল্লামা ইসমাঈল ইবনু কাছীরের ‘তাফসীরুল কুরআনিল ‘আযীম’ (তাফসীরে ইবনু কাসীর), আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনুল কাইয়িমের ‘যাদুল মা‘আদ ফী হাদ-ই খইরিল ‘ইবাদ’ ইত্যাদি গ্রন্থসহ ইসলাম, আহলুত তাওহীদ ও আল্লাহর পথে জ্ঞানগত দূরদর্শীতা নিয়ে যারা দাওয়াতী কাজ করে এমন ইমামদের গ্রন্থসমূহ, যেমন: শাইখুল ইসলাম আহমাদ ইবনু তাইমিয়্যাহ, মুজাদ্দিদ ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব রহিমাল্লামাহর গ্রন্থাবলী। হিজরী দ্বাদশ শতাব্দী হতে আজ পর্যন্ত জাযীরাতুল আরবসহ আরো কতিপয় স্থানে শিরক ছড়িয়ে পড়ার পরে, যার (ইমাম

মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব) মাধ্যমে এবং তাওহীদপন্থীদের আমীর মুহাম্মাদ ইবনু সা'উদের সহযোগিতায় আল্লাহ তা'আলা দীন ইসলামকে এবং তাওহীদের আকীদাকে শক্তিশালী করেছেন।

পক্ষান্তরে প্রাদ্যবিদ, ইসলাম বিরোধী; অথচ ইসলামের দিকে নিজেদেরকে সম্পৃক্তকারী দলের বইসমূহ, যার মাধ্যমে তারা ইসলামের বিপরীত কার্যক্রমের দিকে আহ্বান করে, যাদের অধিকাংশের বর্ণনা ইতোপূর্বে গত হয়েছে অথবা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল সাহাবী অথবা তাদের কতিপয়কে গালিগালাজ করে অথবা আল্লাহ তা'আলার তাওহীদের দিকে আহ্বানকারী ইমামদের ব্যাপারে সমালোচনা করে, যে সকল ইমামদের মধ্যে রয়েছে: ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ, ইবনুল কাইয়িম, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব প্রমুখ এবং তাদের উপরে মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করে, এসব গ্রন্থ হচ্ছে পথভ্রষ্টকারী গ্রন্থ। সুতরাং এগুলো পাঠ করা অথবা এর দ্বারা ধোঁকায় নিপতিত হওয়া থেকে সাবধান থাকবে।

তৃতীয়ত: ইসলামের মযাহাবসমূহ:

সকল মুসলিমরা একই মাযহাবের উপরে রয়েছে, তা হচ্ছে ইসলাম। আর তাদের আশ্রয়স্থল হচ্ছে আল-কুরআন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস। আর

ইসলামী মাযহাবসমূহ হিসেবে যে গুলোকে নামকরণ করা হয়, যেমন: চার মাযহাব তথা হাম্বলী, মালিকী, শাফিয়ী ও হানাফী, এ গুলোর অর্থ হচ্ছে ইসলামী ফিকহের পাঠশালা, যাতে এ সমস্ত আলিমগণ ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহের পাঠদান করেন। এদের প্রত্যেকটির উৎস হচ্ছে আল-কুরআন ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসসমূহ। আর তাদের মধ্যে যেসব ইখতিলাফ (মতবিরোধ) রয়েছে, তা হলো প্রাসঙ্গিক কিছু মাসায়েল সমূহে। সে ব্যাপারে প্রতিটি আলিমই তার ছাত্রদেরকে আদেশ করেছেন, তারা যেন এক্ষেত্রে কুরআন ও হাদীসের নসের উপরে নির্ভরশীল কথাগুলোই কেবল গ্রহণ করে; যদিও তার প্রবক্তা অন্য কেউ হোক।

মুসলিম এগুলোর কোন একটি গ্রহণে বাধ্য নয়; বরং সে কুরআন ও হাদীস থেকে বাধ্য। তবে এ সমস্ত মাযহাবের দাবিদার অসংখ্য মানুষের মধ্যে আকীদাগত বিকৃতি ও বিচ্যুতির ফলে দেখা যায়, তারা কবরের কাছে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড করে, যেমন: তাওয়াফ করা, কবরবাসীদের কাছ থেকে সাহায্য চাওয়া, আবার আল্লাহর সিফাতের ব্যাপারে তা'ওয়ীল করা, সেগুলোকে বাহ্যিক অর্থ থেকে পরিবর্তন করা ইত্যাদি, এরা সবাই আকীদার ক্ষেত্রে তাদের মাযহাবের ইমামদের বিরোধী; কেননা ইমামদের আকীদা হচ্ছে

নেককার সালাফদের আকীদা, যার বর্ণনা নাজাতপ্রাপ্ত দলের আলোচনাতে ইতোমধ্যেই গত হয়েছে।

চতুর্থত: ইসলাম বহির্ভূত দলসমূহ:

ইসলামী দেশসমূহে অসংখ্য দল রয়েছে, যারা ইসলাম বহির্ভূত। এরা নিজেদেরকে ইসলামের দিকে সম্পৃক্ত করে আর নিজেদেরকে মুসলিম (দল) হিসেবে দাবী করে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা অমুসলিম। কেননা তাদের আকীদা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা, তাঁর আয়াতসমূহ এবং তাঁর একত্ববাদকে অস্বীকার করার আকীদা। এ সমস্ত দলের মধ্যে রয়েছে:

১। বাত্বিনী সম্প্রদায়:

তারা হুলুল (সর্বস্থানে আল্লাহ বিরাজমান বা মাখলূকের মধ্যে আল্লাহর অস্তিত্ব মিশতে পারে) এবং পুনর্জন্মের আকীদাতে বিশ্বাস করে। এছাড়াও তারা মনে করে কুরআন-হাদীসের সকল মূলপাঠের (নসের) একটি বাত্বিনী বা গোপনীয় অর্থ রয়েছে, যা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বর্ণনা ও মুসলিমরা যে বিষয়ের উপরে ঐক্যমত পোষণ করেছেন তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আর তারা তাদের প্রবৃত্তির অনুসরনে উক্ত বাত্বিনী বা গোপনীয় অর্থ তৈরী করে। [৮২] বাত্বিনীদের উৎপত্তি হয়েছিল একদল ইহুদী, অগ্নিপূজক ও পারস্যের ধর্মহীন দার্শনিকদের হাতে, যখন তাদের উপরে ইসলাম বিজয়ী হয়ে

গেল, তখন তারা একত্রিত হয়ে একটি দল (মাযহাব) তৈরীর পরামর্শ করল, যার উদ্দেশ্য ছিল মুসলিমদেরকে বিভক্ত করে ফেলা এবং কুরআনের অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপারে চিন্তার ক্ষেত্রে গোলযোগ তৈরী করা; যাতে তারা মুসলিমদেরকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে পারে। সুতরাং সে অনুযায়ী তারা এ বিধ্বংসী দলটির গোড়াপত্তন করে এবং এর প্রতি দাওয়াত দিতে থাকে। তারা এটিকে আহলুল বাইত (নবী পরিবার) এর সাথে সম্বন্ধ জুড়ে দেয়, আর দাবী করতে থাকে যে, তারা তাদের অনুসারী বা ভক্তবৃন্দ; যেন অধিকতর সুচারুভাবে সাধারণ জনগণকে পথভ্রষ্ট করা যায়। আর এভাবে তারা মূর্খদের মধ্য হতে অসংখ্য মানুষকে শিকার বানিয়ে তাদেরকে হক থেকে পথচ্যুত করেছে।

২। এসব ফিরকার মধ্যে রয়েছে কাদিয়ানী ফিরকা: এটা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর দিকে সম্পর্কযুক্ত। তার ব্যাপারে প্রসিদ্ধ হচ্ছে যে, সে নবুওয়তের দাবী করেছিল এবং ভারত ও আশেপাশের নিম্ন শ্রেণির সাধারণ জনতাকে সে তার প্রতি ঈমান আনার আহ্বান জানিয়েছিল। ভারতে ইংরেজদের ঔপনিবেশিক শাসনামলে ইংরেজরা তাকে এবং তার অনুসারীদেরকে ব্যবহার করেছিল এবং তাকে তার অনুসারীদেরসহ প্রচুর সুযোগ-সুবিধা দান করেছিল; যাতে অধিকাংশ মূর্খরা তার অনুসরণ করে। সুতরাং কাদিয়ানীরা ইসলামকে বাহ্যিকভাবে প্রকাশ করলেও তারা ইসলামকে

ধ্বংস করা ও তাদের সাধ্যানুযায়ী ইসলামের গণ্ডি থেকে মানুষকে বের করার সমূহ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। এটাও প্রসিদ্ধ যে, সে (গোলাম আহমাদ) একটি কিতাব রচনা করে, যার নাম: “তাসদীক্বু বারাহীনি আহমাদিয়্যাহ”, এ গ্রন্থেই সে নবুওয়ত দাবী করে এবং এতে সে ইসলামের নসসমূহের বিকৃতি ঘটায়। তার বিকৃতির মধ্যে অন্যতম একটি দাবী ছিল: যে জিহাদ

ইসলামে রয়েছে, তা মানসূখ (রহিত) হয়ে গেছে। আর প্রতিটি মুসলিমের জন্য ইংরেজদের সাথে সন্ধি করে নেওয়া ফরয। সে এ সময়ে “তিরইয়াকুল ক্বুলূব” নামে আরও একটি গ্রন্থ রচনা করে। এই মিথ্যাবাদী লেখক অসংখ্য মানুষকে বিভ্রান্ত করার পরে ১৯০৮ সালে মারা যায়। এরপরে তার দাওয়াত ও তার দলের নেতৃত্ব একজন পথভ্রষ্ট ব্যক্তির কাছে প্রদান করে যায়, যার নাম হাকীম নূরুদ্দিন।

৩। বাহায়ী নামে বাত্বিনী ফিরকার মধ্য হতে আরো একটি ইসলাম বহির্ভূত সম্প্রদায় রয়েছে, যারা ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছে। উনিশ শতকের শুরুতে আলী ইবনু মুহাম্মাদ অথবা কেউ কেউ বলে: মুহাম্মাদ আলী আশ-শীরাজী নামে ইরানের এক ব্যক্তি একে প্রতিষ্ঠা করেছিল। সে শিয়াদের দ্বাদশ ইমামের অনুসারীদের একজন ছিল। তারপরে সে একটি বিশেষ মতবাদ পেশ করে সেখান থেকে আলাদা হয় এবং নিজেকে প্রতিশ্রিত মাহদী হিসেবে দাবী করে। এরপরে

সে দাবী করে যে, আল্লাহ তা'আলা তার মধ্যে অবতরণ করেন; প্রকৃতপক্ষে কাফির ও আল্লাহদ্রোহীরা যা বলে, আল্লাহ তা হতে সুমহান পবিত্র। সে এর সাথে পুনরুত্থান, হিসাব, জান্নাত ও জাহান্নামকে অস্বীকার করে ব্রাহ্মবাদ ও বৌদ্ধ কাফিরদের পথ অনুসরণ করে। সে ইহুদী, খৃষ্টান ও মুসলিমদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই বলে এক করে ফেলে। তারপরে সে শেষনবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়তকে অস্বীকার করে এবং ইসলামের বহু বিধানকে অস্বীকার করে। এ ব্যক্তির মৃত্যুর পরে তার বাহা নামক এক মন্ত্রী তার এ দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং তার দাওয়াত প্রসার করে এবং তার অনুসারী বৃদ্ধি হয়। আর এ লোকের দিকে সম্পৃক্ত করেই বাহায়ী সম্প্রদায়ের নামকরণ করা হয়েছে।

৪। ইসলামের দাবী করা, সালাত আদায় করা, সিয়াম পালন করা ও হজ্জ পালন করার পরেও ইসলাম বহির্ভূত আরও ফিরকার মধ্যে রয়েছে শিয়াপন্থীদের একটি বড় দল, যারা মনে করে জিবরীল আলাইহিস সালাম মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রিসালাত দেওয়ার ক্ষেত্রে আমানাতের খিয়ানাত করেছিল। তাকে মূলত আলী রদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে পাঠানো হয়েছিল। তাদের কেউ কেউ বলে: আলী স্বয়ং আল্লাহ। তারা আলী রদিয়াল্লাহু আনহু ও তার সন্তান, নাতী-নাতনী, তার স্ত্রী ফাতিমা ও তার

(ফাতিমার) মাতা খাদিজা রদিয়াল্লাহু আনহুমদের সন্মান ও মর্যাদার ক্ষেত্রে অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করে। বরং তারা তাদেরকে আল্লাহর সাথে ইলাহ বানিয়ে ফেলে, তাদেরকে গুনাহ হতে পবিত্র মনে করে এবং তাদের মর্যাদা রাসূলগণ আলাইহিমুস সালাম থেকে আল্লাহর কাছে বেশি হওয়া ইত্যাদি বিশ্বাস করে।

আর এরা বলে: যে কুরআন আজ মুসলিমদের হাতে রয়েছে, তার মধ্যে অনেক কমতি ও বাড়তি রয়েছে। তাই তারা তাদের নিজেদের জন্য বিশেষভাবে অসংখ্য মুসহাফ তৈরী করেছে। তারা নিজেদের কাছ থেকে অসংখ্য আয়াত ও সূরা বানিয়ে সেখানে স্থাপন করেছে। নবীর পরে উম্মাতের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম মানুষ আবু বাকর ও উমারকে তারা গালিগালাজ করে। এছাড়াও উম্মুল মুমিনীন আয়িশা রদিয়াল্লাহু আনহাকেও তারা গালাগালি করে। তারা আনন্দ ও বিপদের মূহুর্তে আলী ও তার সন্তানদের মাধ্যমে বিপদ থেকে উদ্ধার কামনা করে। আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদেরকে ডাকে; অথচ আলী রদিয়াল্লাহু আনহু ও তার সন্তানেরা এদের থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। কেননা তারা তাদেরকে আল্লাহর সাথে ইলাহ বানিয়েছে, আল্লাহর উপরে মিথ্যাচার করেছে এবং তাঁর কালামকে বিকৃত করেছে। তারা যা বলে, তা থেকে আল্লাহ সুমহান পবিত্র। [৮৩]

আমাদের উল্লেখিত এ সমস্ত কাফির ফিরকাগুলো হচ্ছে ইসলামের দাবীদার; অথচ তারা ইসলামকে ধ্বংস করার কাজে লিপ্ত কাফির ফিরকাগুলোর মধ্যে গণ্য। সুতরাং প্রতিটি স্থানে অবস্থানরত হে জ্ঞানী ও মুসলিম ব্যক্তি! তুমি সতর্ক থেক এ মর্মে যে, ইসলাম শুধুমাত্র দাবী করার নাম নয়; বরং তা হচ্ছে কুরআনকে জানা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আগত প্রতিষ্ঠিত হাদীসসমূহ জানা এবং তার উপরে আমল করা। সুতরাং তুমি মহিমান্বিত আল-কুরআন ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসসমূহ নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করো, তাতে তুমি হিদায়াত, নূর এবং এমন সীরাতে মুসতাকীমের সাক্ষাত পাবে, যা তার পথচারীকে রাব্বুল আলামীনের কাছে নিয়ামাতপূর্ণ জান্নাতের সৌভাগ্যের পথে পৌঁছে দেয়।

মুক্তির দিকে দাওয়াত

হে বিবেকবান মানুষ! তুমি পুরুষ হও বা নারী, এখনো যারা ইসলামে প্রবেশ করেনি, তোমাকে উদ্দেশ্য করে আমি নাজাত ও সৌভাগ্যের এ দাওয়াত পেশ করছি। সুতরাং আমি বলবো:

তোমার নিজেকে মৃত্যুর পরে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করো এবং তারপরে আসা জাহান্নামের আগুন থেকেও রক্ষা করো।

আল্লাহ তা'আলার প্রতি রব হিসেবে ঈমান এনে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসূল হিসেবে এবং ইসলামকে দীন হিসেবে গ্রহণ করার মাধ্যমে তুমি তোমাকে রক্ষা কর। অতএব তুমি বলো: لا إله إلا الله محمد رسول الله: “আল্লাহ ছাড়া কোন প্রকৃত ইলাহ নেই, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল।” পাঁচ ওয়াস্ত সাত আদায় করো, তোমার সম্পদের যাকাত আদায় করো, রমাদানে সিয়াম পালন করো আর আল্লাহর ঘর হারামে পৌঁছানোর সামর্থ থাকলে হজ্জ পালন করো।

তুমি আল্লাহর প্রতি তোমার আত্মসমর্পণকে (ইসলামকে) প্রকাশ্যে ঘোষণা করো। কেননা এটা ছাড়া মুক্তি বা সৌভাগ্য [৮৪] লাভের কোন উপায় নেই।

আর আমি তোমাকে এ মর্মে ঐ মহান আল্লাহর কসম করে বলছি, যিনি ছাড়া প্রকৃত কোন ইলাহ নেই, নিশ্চয় এ ইসলাম হচ্ছে সত্য দীন, যেটা ছাড়া আল্লাহ অন্য কোন দীনকে কারো কাছ থেকে গ্রহণ করবেন না। আমি আল্লাহকে, তাঁর ফেরেশতাদেরকে এবং আল্লাহর সমস্ত সৃষ্টিকে সাক্ষ্য রেখে বলছি, আল্লাহ ছাড়া কোন প্রকৃত ইলাহ

নেই, আর মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, আর ইসলামই সত্য, আর নিশ্চয় আমি মুসলিমদের মধ্য হতে একজন।

আমি আল্লাহ সুবহানাল্হ ওয়া তা'আলার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন তাঁর রহমত ও অনুগ্রহে আমাকে, আমার সন্তানদের এবং আমাদের সকল মুসলিম ভাইদেরকে প্রকৃত মুসলিম অবস্থায় মৃত্যুদান করেন এবং আমাদের সকলকে আমাদের বিশ্বাসী ও সত্যবাদী নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামসহ অন্যান্য নবীগণের সাথে, আমাদের নবীর পরিবার ও সাহাবীদের সাথে নিয়ামাতপূর্ণ জান্নাতে একত্রিত করেন। আমি আল্লাহ তা'আলার কাছে আরো প্রার্থনা করি যে, তিনি এ কিতাবের প্রতিটি পাঠক অথবা শ্রোতাকে এ কিতাব দ্বারা উপকৃত করেন। ... আমি কী আমার পয়গাম পৌঁছে দিয়েছি? হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকেন।

আল্লাহই ভালো জানেন। আমাদের নবী মুহাম্মাদ, তার পরিবার ও সাহাবীদের উপরে আল্লাহ সালাত (রহমত) বর্ষণ করুন! আর সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহরই প্রাপ্য।

সামগ্রী

সত্য ধর্ম.....	1
ভূমিকা ও উৎসর্গ.....	3
প্রথম অধ্যায়: মহান স্রষ্টা আল্লাহর [১] পরিচয়	6
প্রথম অকাট্য প্রমাণ:	6
আয়াতে কারীমাহর সংক্ষিপ্ত অর্থ:	7
আয়াতে কারীমাহর সংক্ষিপ্ত অর্থ:	9
দ্বিতীয় অকাট্য প্রমাণ:	10
তৃতীয় অকাট্য প্রমাণ:.....	10
চতুর্থ অকাট্য প্রমাণ:.....	10
পঞ্চম অকাট্য প্রমাণ:.....	11
ষষ্ঠ অকাট্য দলীল:.....	11
সপ্তম অকাট্য প্রমাণ:.....	12
অষ্টম অকাট্য প্রমাণ:.....	12
নবম অকাট্য প্রমাণ:.....	12
দশম অকাট্য প্রমাণ:	13
আয়াতসমূহের অর্থ:.....	14
আয়াতসমূহের সংক্ষিপ্ত অর্থ:	19
আয়াতসমূহের সংক্ষিপ্ত অর্থ:	25

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে জানা.....	31
আয়াতসমূহের সংক্ষিপ্ত অর্থ:	41
তৃতীয় অধ্যায়: সত্যে দীন- ইসলাম- সম্পর্কে জানা	44
ইসলামের পরিচয়:.....	45
আয়াতদ্বয়ের সংক্ষিপ্ত অর্থ:	46
আয়াতটির সংক্ষিপ্ত অর্থ:.....	48
আয়াতটির সংক্ষিপ্ত অর্থ:.....	49
ইসলামের রুকনসমূহ.....	51
১- দু'আ করা:.....	53
২- যবাই করা, মানত করা এবং কুরবানী করা:.....	55
৩- বিপদ হতে উদ্ধারের প্রার্থনা (ইস্তিগাছাহ), সাহায্য চাওয়া (ইস্তি'আনাহ) এবং আশ্রয় চাওয়া (ইস্তি'আযাহ): [১৭].....	56
রাসূলগণের দায়িত্ব যা দিয়ে আল্লাহ তাদের প্রেরণ করেছেন।.....	69
আয়াত দুটির অর্থ:.....	73
উদাত্ত আহ্বান.....	74
ইসলামের দ্বিতীয় রুকন: সালাত.....	75
আয়াতদ্বয়ের সংক্ষিপ্ত অর্থ:	77
পাঁচ ওয়াক্ত সালাত:.....	78
সালাতের বিধানসমূহ.....	79
প্রথমত: পবিত্রতা অর্জন:.....	79

দ্বিতীয়ত: সালাতের পদ্ধতি:	82
১- ফজরের সালাত:	82
২- যোহর, আসর ও ইশার সালাত:	86
৩- মাগরিবের সালাত:	86
ইসলামের তৃতীয় রুকন: যাকাত	88
ইসলামের চতুর্থ রুকন: সিয়াম	92
সিয়াম পালনের পদ্ধতি:	92
সিয়াম পালনে অসংখ্য উপকারিতা রয়েছে। তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ উপকারিতাগুলো হচ্ছে:	92
ইসলামের পঞ্চম রুকন: হজ্জ	96
হজ্জ ও উমরার পদ্ধতি:	99
যখন সে মীকাতে পৌঁছবে, তখন সে সেখান থেকে ইহরাম বেধে নেবে, যদি সে গাড়ী অথবা অনুরূপ কিছুতে থাকে। আর যদি সে বিমানে থাকে, তাহলে মীকাত অতিক্রম করার আগেই মীকাতের নিকটবর্তী স্থানে ইহরাম বেধে নেবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব স্থান থেকে মানুষদেরকে ইহরাম বাঁধার আদেশ করেছেন, সেগুলো সংখ্যা পাঁচটি। তা হচ্ছে:	100
ইহরামের পদ্ধতি:	101
ইহরামকারীর জন্য হারাম বিষয়সমূহ:	103
ঈমান	112
তাকদীরের উপর ঈমান আনার অর্থ:	114

ইতিপূর্বে যা কিছু আলোচনা করা হয়েছে এর প্রতিটি বিষয়ের উপরে মুসলিমের ঈমান আনা আবশ্যিক।.....	115
দীন ইসলামের পূর্ণতা.....	116
পূর্বে উল্লেখিত আয়াতসমূহে:.....	118
চতুর্থ অধ্যায়: ইসলামের পথ-পদ্ধতি.....	121
প্রথমত: ইলম (জ্ঞানার্জন) সংক্রান্ত বিষয়ে:.....	121
ইসলামে আবশ্যিকতার দিক থেকে ইলম বা জ্ঞান কয়েক প্রকার:	122
দ্বিতীয়ত: আকীদা সংক্রান্ত বিষয়ে:.....	123
তৃতীয়ত: মানুষের মধ্যকার সম্পর্ক সংক্রান্ত বিষয়ে:.....	124
চতুর্থত: মুরাকাবা বিষয়ে এবং মুমিন ব্যক্তির জন্য অন্তরগত উপদেশকারী:.....	127
পঞ্চমত: সামাজিক সহযোগিতা ও পারস্পারিক দায়িত্ববোধ সংক্রান্ত ব্যাপারে:.....	129
ষষ্ঠত: আভ্যন্তরীণ রাজনীতি বিষয়ে:.....	133
সপ্তমত: আন্তর্জাতিক রাজনীতি সংক্রান্ত বিষয়ে:.....	137
অষ্টমত: স্বাধীনতা সংক্রান্ত বিষয়ে:.....	139
(ক) আকীদার স্বাধীনতা:.....	139
ইসলাম বিধবংসী কার্যক্রম অসংখ্য। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে:.....	141
পঞ্চম অধ্যায়: কতিপয় সন্দেহের অপনোদন.....	172